†g 2022 ▪ ˆekvL-ˆR¨ô 1429

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

†kL nvwmbvi ¯‡`k cZ¨veZb

c‡nj v †g AvšRwZK kwgK w`em

iex›` I bRiæj Rqšx

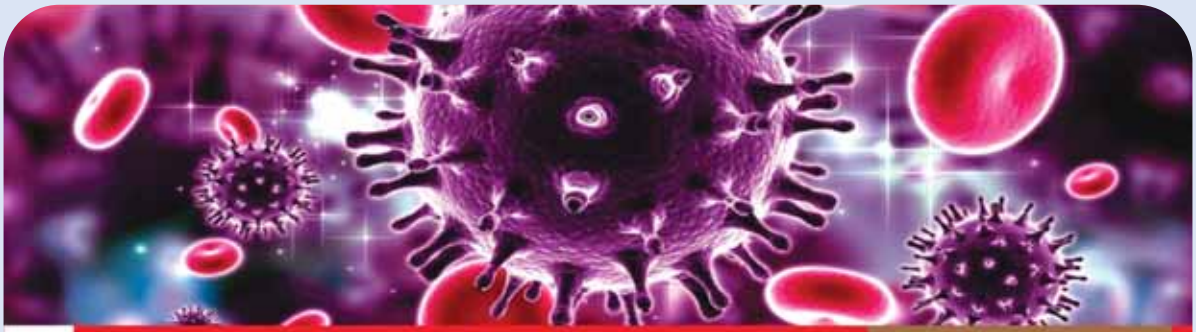

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

Pjw”PÎ I cKvkbv Awa`ßi, Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মে ২০২২ ⌟ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে এপ্রিল ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে সারা দেশে ৩২ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে ঈদুল ফিতর-এর উপহার হিসেবে নবনির্মিত ঘরের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। প্রতিবছর ১লা মে সারা বিশ্বে মহান মে দিবস হিসেবে দিনটি পালন করা হয়। উনিশ শতকের গোড়ায় কলকারখানায় সপ্তাহে ৬ দিন গড়ে প্রায় ১০-১২ ঘণ্টার বেশি অমানবিক পরিশ্রম করতে হতো শ্রমিকদের। উপযুক্ত মূল্যের দাবি ও ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা রাস্তায় নামেন। এই শ্রমিকদের ওপর গুলি চলে। এতে নিহত হন ১১ জন শ্রমিক। তাদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবি মেনে নেওয়া হয়। বাংলাদেশেও প্রতিবছর মে দিবস পালিত হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো– 'শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা'। মহান মে দিবস উপলক্ষে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর মে ২০২২ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

১৭ই মে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নির্মমভাবে নিহত হন। এসময় তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পান। পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ সালের ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিনি এদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

২৫শে বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ বিশ্ব কবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ মানবতার কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রয়েছে প্রবন্ধ ও কবিতা।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস হিসেবে পালিত হয়। মা দিবস, ২৮শে মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতা, প্রতিবেদনসহ অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* মে ২০২২ সংখ্যা। আশা করি, পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আইনের শাসন ৭
শ্যামল দত্ত

মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমিক ১০
ড. মোহাম্মদ আলী খান

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা ১৩
আফরোজা নাইচ রিমা

বাঙালির মানসগঠন ও সংকটোত্তরণে
রবীন্দ্রভাবনায় চেতনার অনুরণন ১৫
আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

নজরুলের নাটক ২১
আতিক আজিজ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ ২৬
জিনাত আরা আহমেদ

ঘুরে এলাম দুটি পাতার একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট ২৭
সেলিনা আকতার

আলোকিত মানুষের প্রাণ:
হাসান হাফিজুর রহমান ৩০
ম. মীজানুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরমবন্ধু ইন্দিরা গান্ধী ৩২
পাপিয়া সুলতানা পান্না

নিরাপদ মাতৃত্ব রক্ষায় চাই জনসচেতনতা ৩৪
কাকলী ইয়াসমিন

'মা' একটি মধুর শব্দ ৩৫
প্রশান্ত দে

গল্প

টাইগার নাজিরের অন্তর্ধান ৩৬
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ

৪০-৪৪

শাফিকুর রাহী, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, আবুল হোসেন আজাদ, নাহার আহমেদ, বাবুল তালুকদার, মোহাম্মদ আহছানউল্লাহ্, গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন, জিশান মাহমুদ, ওয়াসীম হক, গোলাম নবী পান্না, বশিরুজ্জামান বশির, অপু বড়ুয়া, শিল্পী ভদ্র, মনির জামান, রোকসানা গুলশান, সন্তোষ রায়, আহসানুল হক, জাওয়াদুল ইসলাম ভুঁইয়া, কামাল হোসাইন, আজহার মাহমুদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৫
প্রধানমন্ত্রী	৪৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৪৭
আন্তর্জাতিক	৪৮
উন্নয়ন	৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৪৯
শিল্প-বাণিজ্য	৫০
শিক্ষা	৫১
বিনিয়োগ	৫১
নারী	৫২
সামাজিক নিরাপত্তা	৫২
কৃষি	৫৩
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৪
স্বাস্থ্যকথা	৫৫
নিরাপদ সড়ক	৫৫
বিদ্যুৎ	৫৬
যোগাযোগ	৫৭
কর্মসংস্থান	৫৮
সংস্কৃতি	৫৮
চলচ্চিত্র	৫৯
মাদক প্রতিরোধ	৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬১
প্রতিবন্ধী	৬১
ক্রীড়া	৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন সাংবাদিক, কবি ও গীতিকার কে জি মোস্তফা	**৬৩**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

মহান মে দিবস ২০২২ উপলক্ষে ১লা মে ২০২২ শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই এপ্রিল ২০২২ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে গেলেও পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন এখনও স্বমহিমায় টিকে আছে। সারা বছরের ক্লেদ-গ্লানি-হতাশা ভুলে এদিন সব বাঙালি নতুন আনন্দ-উদ্দীপনায় মেতে উঠেন। তিনি ভাষণে আরও আহ্বান জানান, পারস্পরিক সৌহার্দ্য আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আসুন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলা নতুন বছরের আনন্দ উপভোগ করুন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা–৪

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আইনের শাসন

১৯৭৫-পরবর্তী নির্বাসিত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের ভোট আর ভাতের অধিকার। তাঁর নেতৃত্বে গণতন্ত্র যেমন সুরক্ষিত হয়েছে, তেমনি দেশজুড়ে দৃশ্যমান এখন অসংখ্য উন্নয়ন। একইভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এ বিষয়ে 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আইনের শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৭

মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমিক

বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণি বরাবরই মে দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। স্বাধীনতার পর 'মে দিবস' পায় সরকারি ছুটি ঘোষণার মর্যাদা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখেন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর শতাধিক দেশ ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আইএলও-এর ১নং কনভেনশন অনুসমর্থন (রেটিফাই) করেছে এবং এ প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়ন করেছে। ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক কল্যাণে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহান মে দিবস উপলক্ষে 'মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমিক' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১০

রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বাঙালি হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ এবং গভীর প্রভাব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'বাঙালির মানসগঠন ও সংকটোত্তরণে রবীন্দ্রভাবনায় চেতনার অনুরণন' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-১৫

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদা দেন। শোষক, শাসক, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, শঠতা, প্রতারণাসহ সকল অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে রণতূর্য বাজিয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সব শাখায় সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তাঁর ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'নজরুলের নাটক' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই এপ্রিল ২০২২ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[১৩ই এপ্রিল ২০২২]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাগতিক নিয়মের পথ-পরিক্রমায় বছর শেষে আমাদের মধ্যে আবার এসেছে নতুন বছর– ১৪২৯ বঙ্গাব্দ। সবাইকে নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ।

মুসলমানদের সিয়াম সাধনার পবিত্র রমজান মাস চলছে এখন। আমি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

১৪২৯ বঙ্গাব্দের এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও দশ বছরের ছোট্ট শেখ রাসেলকে, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ– সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যেই আমরা বিগত দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রম করলাম। এই মরণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমরা হারিয়েছি আমাদের অনেক প্রিয়জনকে, আপনজনকে। আমি সকলের রুহের মাগফেরাত এবং আত্মার শান্তি কামনা করছি। স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

এ ভূখণ্ডের হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির বাহক এদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন ধর্মে-বর্ণে বিভক্ত হলেও ঐতিহ্য ও কৃষ্টির জায়গায় সব বাঙালি এক এবং অভিন্ন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে গেলেও পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন এখনও স্বমহিমায় টিকে আছে। সারা বছরের ক্লেদ-গ্লানি-হতাশা ভুলে এদিন সব বাঙালি নতুন আনন্দ-উদ্দীপনায় মেতে উঠেন। 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো/মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'– কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী এই গান গেয়ে আমরা আবাহন করি নতুন বছরকে।

পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। আবহমানকাল ধরে বাংলার গ্রামগঞ্জে, আনাচেকানাচে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। গ্রামীণ মেলা, হালখাতা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন ছিল বর্ষবরণের মূল অনুষঙ্গ।

ব্যবসায়ীরা আগের বছরের দেনা-পাওনা আদায়ের জন্য আয়োজন করতেন হালখাতা উৎসবের। গ্রামীণ পরিবারগুলো মেলা থেকে সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র কিনে রাখতেন। গৃহস্থ বাড়িতে রান্না হতো সাধ্যমতো উন্নতমানের খাবারের।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের চল ছিল। আজিমপুর, ওয়ারি, ওয়াইজঘাট, মৌলভীবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে হালখাতা উৎসব হতো, মেলা বসতো, মেলায় পণ্য বেচাকেনা, গানবাজনা, যাত্রা-সার্কাস ইত্যাদির আয়োজন হতো। ষাটের দশকে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের বর্ষবরণ সংগীত পরিবেশন শুরু হয়।

সকল সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা পরিহার করে উদার-নৈতিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পহেলা বৈশাখ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। মনের ভেতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে আমাদের নতুন উদ্যমে বাঁচার শক্তি জোগায়, স্বপ্ন দেখায়। আমরা যে বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এই স্বাজাত্যবোধ এবং বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়।

আজ শুধু দেশে নয়, বিশ্বের যে প্রান্তেই বাঙালি তার বসবাস গড়ে তুলেছেন, সেখানেই বাঙালির হাজার বছরের লোকসংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। বর্ষবরণসহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা জানান দেন তারা বাঙালি। আর এর মাধ্যমেই পৃথিবীজুড়ে তৈরি হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সেতুবন্ধ।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাসের কারণে বিগত দুই বছর জনসমাগম করে উন্মুক্ত স্থানে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানমালা করা যায়নি। বর্তমানে করোনাভাইরাসের প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। তাই এবার সীমিত আকারে হলেও বহিরাঙ্গনে অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। তবে করোনাভাইরাস একেবারে নির্মূল হয়নি। নতুনরূপে করোনাভাইরাস আবার যে-কোনো সময় যে-কোনো দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা অবশ্য যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছি। ইতোমধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ টিকা পাওয়ার যোগ্য মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। দ্বিতীয় ডোজের পর এখন বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে।

এই মহামারি শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মহামারিজনিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য আমার সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমরা ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এতে প্রায় ৬ কোটি ৭৪ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার।

প্রিয় দেশবাসী,

করোনাভাইরাসের মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব বাজারে পণ্যের দামে অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য পরিবহণেও ভাড়া ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশেও কিছু কিছু পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে স্বস্তি নিয়ে আসার।

চলতি পবিত্র রমজান মাসে আমরা টিসিবির মাধ্যমে ভরতুকি দিয়ে প্রায় এক কোটি পরিবারকে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী দামে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। রাজধানী ঢাকায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিদিন ১৫টি ফ্রিজার ভ্যানে করে সাশ্রয়ী দামে মাংস, ডিম এবং দুধ বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ইতোমধ্যে কমে স্বাভাবিক পর্যায়ে এসেছে। এছাড়া সরকার আসন্ন ঈদ উপলক্ষে এক কোটি ৩৩ হাজার ৫৪টি ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে এক লাখ ৩৩০ মেট্রিক টনের বেশি চালের বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

কিছু কিছু গণমাধ্যমে এমনভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে যেন দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। আমি দৃঢ়ভাবে আপনাদের জানাতে চাই যে, দেশে চালসহ কোনো পণ্যের ঘাটতি নেই। সাশ্রয়ী দামে পণ্য কেনার জন্য টিসিবির দোকানে মানুষ ভিড় করবে– এটাই স্বাভাবিক। এটাকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার কী কারণ থাকতে পারে?

করোনাভাইরাসের মহামারির সময়ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬.৯৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত অর্থবছরে রেকর্ড ২৪.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে দেশে। এ বছরও আশানুরূপ রেমিটেন্স আসছে। গত বছর রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৪.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে এ বছর রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের অর্থনীতির মূল শক্তি কৃষি। আমাদের সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে চাল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ উৎপাদনে আমরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে চলতি বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন আশা করা হচ্ছে।

আমাদের মেগা প্রকল্পগুলো নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে– কোনো ঋণ নেওয়া হয়নি। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অর্থনৈতিক সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য মেগা প্রকল্পগুলো গ্রহণ করেছি। আর শুধু ঋণ নয়, বিদেশি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তিবায়িত হলে আমাদের অর্থনীতির চেহারা বদলে যাবে। আমরা দেশি-বিদেশি ঋণ নিচ্ছি। তবে তা যাতে বোঝা হয়ে না উঠে সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সম্পদ বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করা।

২০২২ এবং ২০২৩ হবে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের এক মাইলফলক বছর। আর কয়েক মাস পরেই চালু হতে যাচ্ছে বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। এই সেতু জিডিপিতে ১.২ শতাংশ হারে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ বছরের শেষ নাগাদ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার অংশে মেট্রোরেল চালু হবে। আশা করা যায়, মেট্রোরেল রাজধানী ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আগামী অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে চালু হবে দেশের প্রথম টানেল। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিট আগামী বছরের শেষ নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গত মাসে পায়রায় ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্ধারিত সময়ের আগেই উদ্‌বোধন করা হয়েছে। অন্যান্য মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিগত ১৩ বছরে যে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে তা অর্থনীতির সামষ্টিক সূচকগুলো বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়। ২০০৯ সালে জিডিপির আকার ছিল মাত্র ১০২ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালে তা ৪১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৭০২ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২,৫৯১ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ভাবনা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে। গণতান্ত্রিক ধারা সমুন্নত রেখে মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার ফলেই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

তবে আমি মনে করি, দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করা সরকারের দায়িত্ব। জাতির পিতা যে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন তা বাস্তবায়ন করতে অবদান রাখতে পারছি বলে আমরা গর্বিত। যতদিন বেঁচে আছি, মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে কাজ করার সামর্থ্য দিবেন, ততদিন মানুষের জন্য কাজ করে যাব, জনগণের সেবা করে যাব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে চাই:

জীবনের এই পথ, কে বলিতে পারে
বাকি আছে কত?
মাঝে কত বিঘ্ন শোক, কত ক্ষুরধারে
হৃদয়ের ক্ষত?
পুনর্বার কালি হতে চলিব সে তপ্ত পথে,
ক্ষমা করো আজিকার মতো–
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

প্রিয় দেশবাসী,

বাঙালির মুখের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে উপজীব্য করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একদিন এদেশে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, যার উপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। কাজেই আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা মানে আমাদের স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করা।

আজ ১৪২৯ বঙ্গাব্দের শুভ মুহূর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্নাত হয়ে আসুন বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলি যেখানে বৈষম্য থাকবে না, মানুষে মানুষে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, থাকবে না ধর্মে-ধর্মে কোনো বিভেদ। পারস্পরিক সৌহার্দ্য আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আসুন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলা নতুন বছরের আনন্দ উপভোগ করুন। সবাইকে আবারও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আইনের শাসন

শ্যামল দত্ত

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় এভাবেই এদেশের হাজার বছরের নির্যাতিত মানুষের কথা বলেছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও তারা নিরন্ন থেকেছেন দিনের পর দিন। এসব বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এজন্য জীবনের দীর্ঘ সময় তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই ছিল তাঁর রাজনীতির আদর্শ। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'My strength is I love my people, my weakness is I love them too much'.

স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই শুরু হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজ। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে এক সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্নই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি জাতিকে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। এই সংবিধানের মূল স্তম্ভ ছিল: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। তিনি দল-মত নির্বিশেষে সকলের জন্য সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

ঠিক তেমনি ১৯৭৫-পরবর্তী নির্বাসিত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের ভোট আর ভাতের অধিকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়েছিল প্রায় ৫০১ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। এর মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকাই ছিল কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে, কৃষকদের স্বার্থে। ১৯৭২ থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরে মাথাপিছু আয় ৯৩ থেকে ২৭৩ মার্কিন ডলার হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা তাঁকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে পৈশাচিক হত্যার পথ বেছে নেয়।

১৯৭৫-এর আগস্টে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর দুই সন্তানসহ স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী এমএ ওয়াজেদ মিয়ার কর্মস্থল পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন। ছোটো বোন শেখ রেহানাও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। ছোটো ভাই শেখ রাসেলেরও তাঁদের সাথে যাবার কথা ছিল। কিন্তু শিশু রাসেল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার আর যাওয়া হয়নি। ১৯৭৫-এর মর্মান্তিক নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয়। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বেলজিয়ামের ব্রাসেলস থেকে শেখ হাসিনা ও ওয়াজেদ পরিবারের যাবার কথা ছিল প্যারিসে। কিন্তু সেদিন ভোরে জার্মানির বনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ফোন করে জানান,

বাংলাদেশে একটি মিলিটারি ক্যু হয়েছে। এই খবর পেয়ে তাঁরা প্যারিসে না গিয়ে তখনই জার্মানি চলে যান। ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রবাসে অবস্থানরত শেখ হাসিনা স্বামী-সন্তান ও ছোটো বোন শেখ রেহানাসহ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় পান। সেই থেকে প্রবাসে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শুরু হয় দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন। তবে প্রবাসে থেকেও শেখ হাসিনা পিতার মতো দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাজীবন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ ও আবহের মধ্য দিয়েই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। আওয়ামী লীগ যেহেতু জনগণের দল, তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। আর তাই এদেশের সাধারণ মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন।

এদিকে ১৯৮১ সালের ১৪ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে সভাপতি

নির্বাচন করেন। এরপর দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছয় বছর নির্বাসিত জীবনের পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন। তখনকার রাজনীতির মতো সেদিন প্রকৃতিও ছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে গণতন্ত্রকামী লাখ মানুষের ঢল নেমেছিল ঢাকার কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। জননেত্রী শেখ হাসিনাকে একনজর দেখার জন্য মানুষের সে কী আগ্রহ। কুর্মিটোলা বিমানবন্দর থেকে শেরেবাংলা নগর পর্যন্ত জনসমুদ্রে সেদিন 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়েছিল ঢাকার আকাশ-বাতাস।

দেশে ফিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংবর্ধনায় অভিভূত জননেত্রী শেখ হাসিনা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বলেন, 'যেদিন আমি বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছিলাম, সেদিন আমার সবাই ছিল। আমার মা-বাবা, আমার ভাইয়েরা, ছোট্ট রাসেল সবাই বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে এসেছিল। আজকে আমি যখন ফিরে এসেছি, হাজার হাজার মানুষ আমাকে দেখতে এসেছেন, স্বাগত জানাতে এসেছেন, কিন্তু আমার সেই মানুষগুলো আর নেই। তাঁরা চিরতরে চলে গেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'সব হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে এসেছি'। তিনি বলেছিলেন, 'আমার হারাবার কিছু নেই। পিতা-মাতা, ভাই সবাইকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি আপনাদের মাঝেই তাঁদের ফিরে পেতে চাই।'

জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচারসহ জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ১৯৯৬-এর অবাধ ও সুষ্ঠু সপ্তম জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাজনৈতিক জোট বিজয়ী হয়। প্রথমবারের মতো তিনি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি এড়াবার জন্য 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর সপ্তম জাতীয় সংসদে মানবতা লঙ্ঘনকারী এই আইন বাতিল করা হয়। এটি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের পথ প্রশস্ত করে। পরবর্তীকালে বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হত্যাকারীদের অনেকেরই প্রাণদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়। ১৯৯৬-পরবর্তী পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে: (১) দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত গঙ্গা-পদ্মা নদীর ৩০ বছর মেয়াদি পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর, (২) হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি, (৩) বিনামূল্যে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে দেশজুড়ে 'কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক' স্থাপন, (৪) যমুনা নদীর ওপর নির্মিত সুদীর্ঘ 'বঙ্গবন্ধু সেতু' উদ্‌বোধন, (৫) পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিনের সহিংসতা নিরসনে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর এবং (৬) 'অমর একুশে'-র 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে মর্যাদা লাভ।

২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অন্যতম রাজনৈতিক ইশতাহার ছিল ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০০৯ সালের ২৫শে মার্চ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালস্ অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা আসে। স্বাধীনতা লাভের ৩৯ বছর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে ২০১০ সালের ২৫শে মার্চ গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, আইনজীবী প্যানেল এবং তদন্ত সংস্থা। এই চলমান প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে যুদ্ধাপরাধী অনেকের বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে এখন পর্যন্ত টানা তিনটি মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত অর্জন ছিল নজিরবিহীন। তিনি জাতি হিসেবে বাঙালিকে এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছেন।

২০২১-২০২৫ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মেয়াদে বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নেমে আসবে। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ২০১৯-২০২০ বছরে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সবার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ থেকে ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৬২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নিশ্চিত করতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'বীর নিবাস' বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের আবাসন ও নয় লাখ গৃহহীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। *ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম*-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে মানুষের গড় আয়ু এখন প্রায় ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে।

বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু এ বছরই উদ্‌বোধন করা হবে। এই সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে সরাসরি রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে। খুব শিগ্‌গিরই রাজধানীর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার অংশে মেট্রোরেল চালু হতে যাচ্ছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে চালু হতে যাচ্ছে দেশের প্রথম 'টু সিটি ওয়ান টাউন'-এর ধারণায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এখন নির্মাণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করে বাংলাদেশ আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল ক্লাবে প্রবেশ করেছে। স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু–১-এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৩১টি দ্বীপে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট সেবা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' রূপান্তরিত হয়েছে। অসংখ্য তরুণ-তরুণী ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও সাহসী নেতৃত্ব এবং কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশাল সমুদ্রসীমা জয় করেছে। বঙ্গোপসাগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের নতুন অধিকার। একইভাবে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে। ছিটমহলে বসবাসরত অসংখ্য ঠিকানাবিহীন মানুষ নিজেদের পরিচয় খুঁজে পায়। এদিকে সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ।

বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলাতেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব নজিরবিহীন। দেশের স্বল্পআয়ের মানুষদের খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি অর্থনীতিকে রক্ষা করতে আর্থিক অনুদান ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর নির্দেশনাতেই দেশের মানুষ পেয়েছে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বিনামূল্যের টিকা। ২০২০ সালে করোনা সংকট মোকাবিলায় মার্কিন ম্যাগাজিন *ফোর্বস* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেছে। ব্রিটেনের *দ্য ইকোনমিস্ট* অতিমারির মধ্যেও এদেশের অর্থনীতির নিরাপত্তা বিষয়ে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় সব ধরনের অপপ্রচারমুক্ত হয়ে দেশের মানুষকে টিকা গ্রহণে উৎসাহী করেন। এজন্য ২০২২ সালের শুরু থেকেই 'ভ্যাকসিন হিরো'র দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।

১৯৮১ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনা মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে গণতন্ত্র যেমন সুরক্ষিত হয়েছে, তেমনি দেশজুড়ে দৃশ্যমান এখন অসংখ্য উন্নয়ন। একইভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ নির্মূল করে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ এখন প্রধান লক্ষ্য।

শ্যামল দত্ত: লেখক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, dutta209@gmail.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর

বাংলাদেশ রেলওয়ের তৈরি দেশের প্রথম ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর ২৭শে এপ্রিল উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ট্রেনের দুটি বগিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে ডিজিটাল জাদুঘরে। ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকাল। প্রতি সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন রেলস্টেশনে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এটি। রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ তুলে ধরতে ভূমিকা রাখবে এ উদ্যোগ।

আধুনিক প্রযুক্তি আর নান্দনিক কারুকাজে মোড়া এ কক্ষটি আসলে ট্রেনের একটি যাত্রীবাহী বগি। যাতে উন্নত প্রযুক্তি আর দৃষ্টিনন্দন কারুশৈলীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ আর সংগ্রামী ইতিহাস। এ জাদুঘরে দেখা যাবে শৈশব থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি বাঁকে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ভূমিকার ডিজিটাল শিল্পকর্ম। দর্শনার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জাদুঘরে টাচ স্ক্রিন থাকছে সারি সারি। তাতে আঙুল স্পর্শ করতেই ভেসে আসছে ছবি, ভাষণ ও জাতির পিতার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রামাণ্যচিত্র। মনিটরে চাপ দিলেই ভেসে ওঠে এক মহানায়কের জীবনের মহাকাব্য। দেওয়ালজুড়ে টাঙানো বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ সব ছবিও রয়েছে, আছে তাঁর ব্যবহৃত চশমা, প্রিয় তামাক পাইপ আর মুজিব কোটের প্রতিরূপও। বঙ্গবন্ধুর হাতে লেখা চিঠি আর বইও শোভা পাচ্ছে জাদুঘরে। দেশে-বিদেশে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণও আছে এতে। ১৯২০ থেকে ১৯৭৫– ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের যেন জীবন্ত প্রামাণ্য দলিল এ জাদুঘর। দেশের সবকটি রেলওয়ে স্টেশনে নির্ধারিত দিন পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরটি দাঁড়ানো থাকবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রান্তিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনগাথা ছড়িয়ে দিতে ভ্রাম্যমাণ এ জাদুঘরের সূচনা।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ৮ই মে ২০২২ শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মহান মে দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমিক

ড. মোহাম্মদ আলী খান

'ওরা কাজ করে'। প্রতিবছর 'মে দিবসে' দৈনিকের পাতায় কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের একটি আলোকচিত্র এবং তার নিচে এ ধরনের সমাদৃত শব্দগুচ্ছ লেখা থাকে। মে দিবস একই সঙ্গে বন্দনার, বিজয় উৎসবের ও সংগ্রামী শপথ নেওয়ার দিন। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর 'হে মার্কেট স্কোয়ারে' যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল তার রেশ ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। সুদীর্ঘ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল ক্ষণে আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার ৭ই অক্টোবর ১৮৮৪ সালে ঘোষণা করেছিল, '১৮৮৮ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় গণ্য করা হবে।' এরপর শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে মৃত্তিকা। ১৮৮৯ সালে গঠিত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক'-এর প্রথম কংগ্রেসেই 'পহেলা মে' মহান দিবস রূপে, আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর থেকে ইতিহাস, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' –এই সাহসী উচ্চারণ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষের কাছে হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। এই ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার বিশ্বের সর্বত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৯১৯ সালে আইএলও প্রতিষ্ঠার পর গৃহীত প্রথম কনভেনশনই ছিল এই সময়কে নিয়ে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর শতাধিক দেশ এই ১নং কনভেনশন অনুসমর্থন (রেটিফাই) করেছে এবং এ প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণি বরাবরই মে দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। তবে স্বাধীনতার আগে তা ছিল আর এক লড়াইয়ের ইতিহাস। স্বাধীনতার পর 'মে দিবস' পায় সরকারি ছুটি ঘোষণার মর্যাদা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখেন।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণি মে দিবসের চেতনা লালন করে চলেছে। মালিক-শ্রমিক, শ্রমিক-শ্রমিক, মালিক-মালিক সম্পর্কের রসায়নে যে শিল্প সম্পর্ক, তাতে ইতিবাচক অবদান রেখে যাচ্ছে আইএলও। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ এক ব্যতিক্রমধর্মী সম্পর্ক, যেখানে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় উদ্যোগে তার রেশ লক্ষণীয়। যেমন :

(১) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬। এই আইন প্রণয়ন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দেশে প্রচলিত ২৫টি আইন বা অধ্যাদেশ বাতিল করে সময়োপযোগী ও যুগোপযোগী করে একটি নতুন আইন করা হয় যা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ নামে সুপরিচিত। বাংলাদেশের আর কোনো সেক্টরে এ ধরনের সমন্বয় ও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। উক্ত শ্রম আইনের কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে। সর্বশেষ সংশোধনী এসেছে ২০১৮ সালে ৫৮ নং আইনের মাধ্যমে [বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮]।

(২) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ জারির পর শ্রমিকসমাজের কাঙ্ক্ষিত দাবি ছিল একটি বিশদ শ্রম বিধিমালার। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৩৫১-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে প্রণয়ন করে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫। এতে রয়েছে ৩৬৭টি বিধি ও কয়েকটি তফশিল। মে দিবসের চেতনা এই বহুল কাঙ্ক্ষিত বিধিমালায় কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। তবে এই বিধিমালা কার্যক্ষেত্রে এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এর একটি সংশোধনীও (২০২১) প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৩) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি

সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের জন্য একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬। শিল্পবিপ্লব-উত্তর জটিল সমাজব্যবস্থায় শ্রমকল্যাণের ধারণাটি পুরানো হলেও এর বিকাশ হয়েছে বেশ ধীরে। আর্থার জেমস টডের মতে, 'শ্রমকল্যাণ হলো মজুরির বাইরে প্রাপ্য, শ্রমিকদের জন্য যে-কোনো ধরনের মানসিক এবং সামাজিক উন্নয়ন ও সম্ভোগ, যা শিল্পের জন্য একান্ত অপরিহার্য নয়।' বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বহু বছর পর প্রণীত হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬। এতে মোট ধারা রয়েছে ২৩টি। ২০১৩ সালে একবার সংশোধনী আনা হয়। এই আইনের আলোকে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা ২০১০, যা ২০১৫ সালে একবার সংশোধিত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধিত) বিধিমালা ২০১৫ শিরোনামে।

(৪) অত্যাবশ্যক পরিষেবা। অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে বরাবর। অবশেষে ২০২০ সালে প্রণীত হয়েছে আইন। কতিপয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন ২০২০, যার ধারার সংখ্যা ২০টি।

(৫) শ্রমনীতি। দেশ বিভাগের পর তিনটি শ্রমনীতি জারি হয়। স্বাধীনতার পর মোট তিনটি। বর্তমানে সর্বশেষ জারিকৃত শ্রমনীতি হলো 'বাংলাদেশ শ্রমনীতি ২০১২'। দেশের শ্রমক্ষেত্রে শ্রমনীতির প্রভাব অপরিসীম। শ্রমনীতি শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও শিল্প সম্পর্কিত সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বর্তমানে প্রচলিত শ্রমনীতির লক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনা, আন্তর্জাতিক শ্রমমান, অন্যান্য সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার এবং পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে এই শ্রমনীতিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

(৬) শিশুশ্রম। বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক শিশুশ্রমিককে দেশের মানবসম্পদের মূল স্রোতে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন যাদের বয়স ৪-১৪ বছর। তন্মধ্যে ৮৩% পল্লি এলাকায় এবং বাকি ১৭% শহর বা নগরে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুশ্রমিক প্রায় ১.২ মিলিয়ন। বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও'র উদ্যোগের পাশাপাশি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে আইএলও-আইপেক। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ শিশু-কিশোরদের শ্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ সংবলিত একটি অধ্যায় রয়েছে। বাংলাদেশ ২০০১ সালে রেটিফাই বা অনুসমর্থন করেছে আইএলও কনভেনশন নং

ডাকটিকিট ও নোটে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়নসহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং শ্রম আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়াদি সালিশী কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখভাল করা হয়। সমগ্র দেশে বিস্তৃত সাতটি শ্রম আদালত এবং একটি শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত দাবী, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের আইনী প্রতিকার পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। ন্যূনতম মজুরী বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সেক্টরে মজুরী নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করার মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সুসংহত ভূমিকা পালনসহ যুগপোযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সূত্র: পৃষ্ঠা-৩৩, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ও ২৪ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত মোট ৬টি নির্দেশনা নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে:

- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম: শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ক) নারী শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা ও তাদের নিরাপত্তাঃ নারী শ্রমিকদের জন্য তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কর্মজীবী নারী শ্রমিকদের জন্য গৃহায়ন তহবিলের সহায়তায় বন্দর , নারায়ণগঞ্জ এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে অবস্থিত শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে ০২ টি ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট ডরমিটরি নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ডরমিটরিতে বিল্ট-ইন খাটসহ আসবাবপত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন খাটের নিচের অংশ স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডরমিটরির Common Dining Hall ও রান্নাঘরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক service-এর অতিরিক্ত হিসেবে প্রতিটি ফ্লোরে একটি করে কিচেন এবং কাপড়-চোপড় ধোয়ার জায়গা থাকতে হবে। তা ছাড়া ছোট পরিবারের বসবাসের উপযোগী পৃথক কিছুসংখ্যক কক্ষ/ living space রাখা যেতে পারে।
- শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র: শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শ্রমিকদের কল্যাণে কার্যকর করতে হবে। এ কেন্দ্রে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও থাকার জন্য ডরমিটরি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর বিভাগে নতুন ০৩টি শ্রম আদালত স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া ঢাকায় অবস্থিত ০৩টি শ্রম আদালতের ০১টি নারায়ণগঞ্জে এবং ০১টি গাজীপুরে স্থানান্তরের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
- যে-সকল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণের সময় ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সে-সকল শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সার্টিফিকেশনের জন্য একটি National Industrial Safety Academy স্থাপন করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে টঙ্গীতে বিদ্যমান শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI)-এর জমি অথবা তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকাতে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।

সূত্র: পৃষ্ঠা-৩৭, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৮২ (ILO Convention on the Worst Forms of Child Labour, 1999)। শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্মরণীয় উদ্যোগ 'শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০'। ক্রমবর্ধমান শিশুশ্রমের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য পারিবারিক, সামাজিক, সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল মহল প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উদ্যোগ নিয়ে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' বাস্তবায়নে এগিয়ে এলে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমসহ সকল প্রকার শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে যে স্লোগান নেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী: 'মুজিববর্ষের আহ্বান, শিশুশ্রমের অবসান'।

(৭) গৃহকর্মী। ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশে, বিশেষ করে শহর এলাকায় গৃহকর্মীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। এদের সার্বিক কল্যাণ তথা মজুরি, শোভন কাজ, সুরক্ষা, কাজের ঘণ্টা, বিনোদন ইত্যাদি বিষয় সংবলিত একটি নীতি প্রণীত হয়েছে। উক্ত নীতির শিরোনাম 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫'। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

(৮) কেন্দ্রীয় তহবিল। শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নের রূপকল্প নিয়ে গঠিত হয়েছে এই তহবিল। এর অভিলক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় তহবিলে মোট রপ্তানি মূল্যের ০.০৩% প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের রপ্তানিমুখী প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিলের সেবার আওতায় আনা। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ২৩২ (৩) ধারার আলোকে এই তহবিল গঠিত হয়েছে।

(৯) অন্যান্য। শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও প্রণীত হয়েছে– গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড নীতি ২০২০; জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি নীতিমালা ২০১৩; রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতি ২০২০; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ ইত্যাদি। এছাড়া দেশের সবচেয়ে বড়ো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পোশাক রপ্তানি শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৬৬২.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৮ সালে করা হয়েছে ৮০০০ টাকা। এক্ষেত্রে সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, চাহিদা, অসন্তোষ অনেক। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা কাটিয়ে ওঠা সকলের কাম্য।

মহান মে দিবসের চেতনা সারা বিশ্বের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশের সংগ্রামী শ্রমিকেরাও সেই ঐতিহ্যের সাথী। করোনার চরম সময়ে মেহনতী মানুষেরা সবচেয়ে কষ্টের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন। এই বৈশ্বিক মহামারির কারণে গত দুই বছর (২০২০/২০২১) মহান মে দিবস পালিত হয়নি। সেই দুরবস্থার গণ্ডি পেরিয়ে ২০২২ সালে মহান মে দিবসের লাল ঝাণ্ডা আবার উড়েছে শূন্যে, সগৌরবে। ২০২২ সালে মহান মে দিবসের প্রতিপাদ্য : 'শ্রমিক-মালিক একতা/ উন্নয়নের নিশ্চয়তা'। বর্তমান বিশ্ব অনেক প্রতিযোগিতামূলক। মহান মে দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক তথা দেশের শিল্প সম্পর্ক যত সৌহার্দ্যমূলক ও উৎপাদনবান্ধব হবে ততই কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ, গড়ে উঠবে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও উন্নত দেশ।

(তথ্যের উৎস : মহান মে দিবস ২০২২ স্মরণিকা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ লেবার জার্নাল, ভলিউম-৩৬, শ্রম অধিদপ্তর/ শ্রমকল্যাণ শিল্প সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : ড. মোহাম্মদ আলী খান/www.mole.gov.bd)

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক, গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, khanma1234@gmail.com

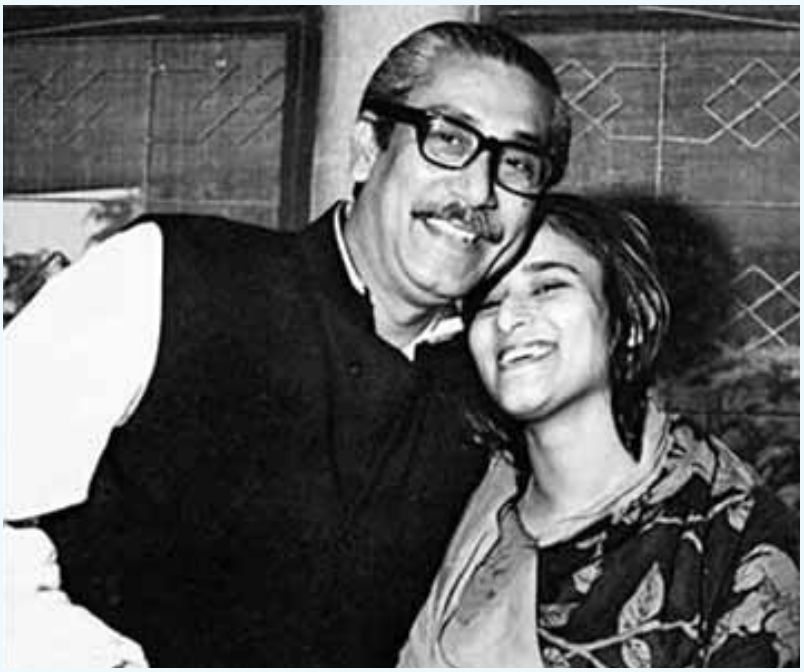

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা

আফরোজা নাইচ রিমা

আমি একাত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলো দেখিনি, তবে জানি একুশ শতকের বিশ্বময় রুদ্ধশ্বাসের গল্পগুলো, যে গল্পরা বলে দূরে দূরে কাছে থাকার কথা। আমি মুজিবকে দেখিনি, দেখেছি তাঁরই সোনার বাংলার দর্শন। আমি এক তর্জনীর মহান শক্তি দেখিনি, দেখেছি বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার অদম্য গতি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নে বিশ্বে রোল মডেল। বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে জানতে হলে জানতে হবে এর ইতিহাস। আর এ ইতিহাসের মূলে রয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি হলেন শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবার বড়ো।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ছোটো বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর নির্বাসিত জীবনযাপনের পর তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফিরে আসেন। ১৭ই মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুধু তাঁর জীবনে নয়, বাংলাদেশের ইতিহাসেও একটি টার্নিং পয়েন্ট। ঐক্যের প্রতীক হিসেবে শেখ হাসিনাকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করা হয় তাঁর বাবার হাতেগড়া সংগঠন আওয়ামী লীগের। তিনি সারা দেশে চষে বেড়িয়ে তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যন্ত দলকে করেন সুসংগঠিত। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা শক্ত হাতে হাল ধরেন আওয়ামী লীগের।

শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সব গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা নব্বইয়ের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষব্যক্তিত্ব। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সংগঠিত করেন। আর এভাবেই সংসদ হয়ে ওঠে জনবান্ধব, প্রতিফলিত হয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হয়ে ওঠেন একজন অনন্য শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। 'বাংলার মানুষের মুক্তি'– এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু আধুনিক রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, যা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁরই দেখানো পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে এমডিজির অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার সকল শর্তপূরণ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের মুহূর্তে ২৬শে ফেব্রুয়ারি (২০২১) জাতিসংঘ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ আজ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৯১ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের গড় আয়ু ছিল ৪৭, এখন ৭২ বছরের ওপরে। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় শতভাগ। সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে অনেক হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়েই সারা দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের স্থান নির্ধারণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মেট্রোরেলের চলমান নির্মাণকাজ, পায়রা সমুদ্রবন্দরের কাজ এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে বহুলেন টানেল নির্মাণের প্রথম টানেল সমাপ্ত হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। মাতারবাড়িতে নির্মাণ করা হচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর। এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর আবার ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে মাওয়া হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের এক্সপ্রেস হাইওয়ের যুগে পা রাখল বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২৯৮টি কর্মসূচি সংবলিত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা বছরব্যাপী নিয়েছে নানা ধরনের জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম, এর মধ্যে সারা দেশে এক কোটি বৃক্ষরোপণ ও সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে গৃহহীন-আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১,৫৩,৭৭৭টি গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জায়গায় ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আধা পাকা ঘর দিচ্ছে সরকার। এছাড়া ৩৬টি উপজেলায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মুজিববর্ষে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর দিচ্ছে সরকার। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগ পেয়েছে অনবদ্য সাফল্য।

বৈশ্বিক করোনা মহামারি মোকাবিলায় সরকার দ্রুততম সময়ে পিসিআর ল্যাব স্থাপন থেকে শুরু করে সমস্ত সেক্টরে সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে এক লক্ষ ২০ হাজার ১৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা মোট জিডিপির চার দশমিক তিন শূন্য শতাংশ।

সরকার ২০২১ সালের ২৭শে জানুয়ারি থেকে প্রথম করোনার টিকা দেওয়ার শুভ সূচনা করেছে, যা গোটা মানবজাতিকে এক চরম অনিশ্চয়তা, হতাশা, উৎকণ্ঠা, গুজব থেকে মুক্তি দেয়। মার্কিন গণমাধ্যম *ব্লুমবার্গ* প্রকাশিত 'কোভিড রেজিলিয়েনস র‍্যাংকিং'-এ দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান প্রথম এবং বিশ্বের ২০তম।

শুধু রাজনীতির সঙ্গেই জড়িত নন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন সুলেখকও। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– *শেখ মুজিব আমার পিতা*; *ওরা টোকাই কেন?*; *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*; *দারিদ্র্য বিমোচন, কিছু ভাবনা*; *আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম*; *আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি*; *সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র*; *সাদা কালো*; *সবুজ মাঠ পেরিয়ে*; *Miles to Go*; *The Quest for Vision-2021* ইত্যাদি।

শেখ হাসিনার রয়েছে যোগ্য এক ছেলে ও এক মেয়ে । ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ একজন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টাও। আর মেয়ে সায়মা হোসেন ওয়াজেদ একজন মনোবিজ্ঞানী এবং তিনি অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে কাজ করছেন। শেখ হাসিনার নাতি-নাতনির সংখ্যা সাত। তাঁর স্বামী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম ওয়াজেদ মিয়া ২০০৯ সালের ৯ই মে ইন্তেকাল করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। সেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান বাঙালি জাতি করোনা মহামারির ভয়াবহতা উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়তে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ও বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ একটি উন্নত জাতি ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে শেখ হাসিনার মতো একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী নেতা পেয়েছে। আর এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র একটি নাম নয়, শতবর্ষে তিনি একটি ইতিহাস, একটি পতাকা, একটি দেশ এবং শেখ হাসিনা হলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। একজনই শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের উন্নয়নে অনন্য শেখ হাসিনা।

একজন মমতাময়ী মা, একজন দূরদর্শী ও প্রতিশ্রুতিশীল রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ কূটনীতিক, একজন দায়িত্বশীল স্ত্রী এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর একজন সুযোগ্য ও সাহসী উত্তরসূরি শেখ হাসিনাকে আমাদের জানতে হবে। আর তখনই আমরা জানতে পারব– দেশপ্রেম কী, মানবতা কী, সহস্র বাধা ডিঙিয়ে জীবনের জন্য, দেশের জন্য তথা জনগণের জন্য কী করে চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায়। একজন নাগরিকও তার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি। জাতির পিতার সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাক অপ্রতিরোধ্য গতিতে– এই প্রত্যাশা করি কায়মনোবাক্যে।

আফরোজা নাইচ রিমা: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, nice_du@yahoo.com

নিউইয়র্কে gyRe Avgvi wcZv

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে নিউইয়র্কে প্রদর্শিত হলো বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক দেশের প্রথম অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র *মুজিব আমার পিতা*। ৮ই মে নিউইয়র্কের কুইন্সে বোম্বে থিয়েটার হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক এ চলচ্চিত্রের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। দেশে-বিদেশের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরসহ সকলের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গল্প পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ অ্যানিমেশন মুভিটি তৈরি করে।

টুঙ্গিপাড়ার প্রতিবাদী কিশোর একদিন হয়ে উঠলেন একটি দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, ইতিহাসের মহানায়ক। মহাসংগ্রামের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার একটি পর্যায়; ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন– সংসদ সদস্য মো. নুরুল আমিন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা, হাইটেক পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি দেখার জন্য কুইন্সের বোম্বে থিয়েটারে জমায়েত হয়েছিলেন অসংখ্য প্রবাসী।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে আমরা *মুজিব আমার পিতা* সিনেমাটি প্রদর্শন করেছি। বিশ্ব দরবারে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন এবং রাজনৈতিক আদর্শকে তুলে ধরার জন্যই নিউইয়র্কে এই ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

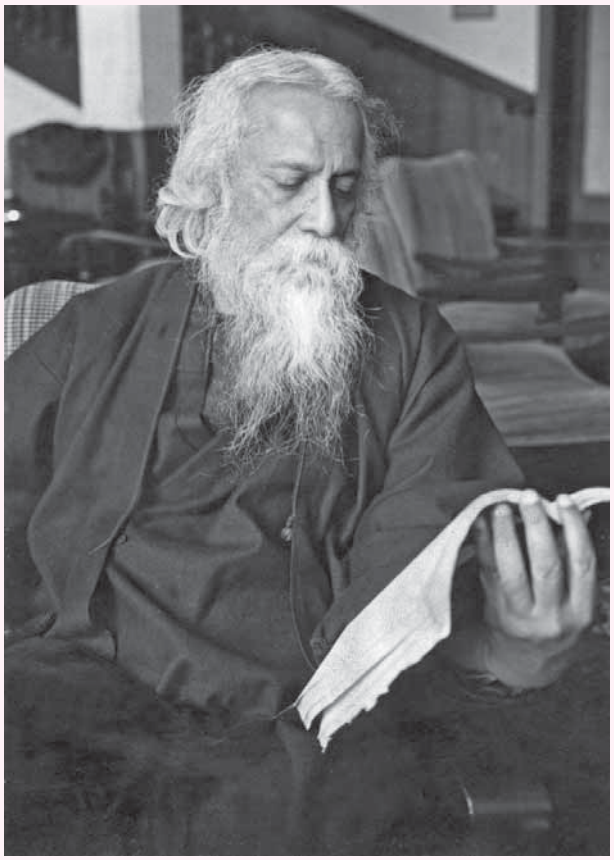

বাঙালির মানসগঠন ও সংকটোত্তরণে রবীন্দ্রভাবনায় চেতনার অনুরণন

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

বিশ্বকবি তাঁর বিশ্বপ্লাবী সাহিত্য ভাণ্ডারে কত কিছুই তো সঞ্চিত রেখেছেন! বাঙালির মানসগঠন ও নানা সংকটোত্তরণে নতুন নতুন ভাবনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন; কেবল লেখনি দিয়ে নয়, মাঠপর্যায়ে তা করিয়েও দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি পেয়েছে তার পথের সন্ধান; স্বাধিকার-স্বাধীনতার মুক্তবাতায়নে কবিশ্রেষ্ঠকে সে আবিষ্কার করেছে দিক নির্দেশকের ভূমিকায়; তাঁর কালোত্তীর্ণ লেখনীতে বিচ্ছুরিত হয়েছে নব উদ্যমে এগিয়ে চলার অপ্রতিরোধ্য প্রাণশক্তি। সংকটকালে এই যুগস্রষ্টাকে কত কাছাকাছি টেনে নেওয়া যায়, তারই ঈষৎ প্রয়াস মাত্র–

> মানুষ হ', মানুষ হ'
> আবার তোরা মানুষ হ'
> বিশ্বমানব হবি যদি কায়মনে বাঙালি হ'।
>
> সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী
> রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি।

বাঙালিকে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টার যেন বিন্দুমাত্র কমতি নেই এই মহান কবিগুরুর। রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবার্ষিকীকে (১৮৬১–২০১১) উপজীব্য করে 'রবীন্দ্র প্রভাবে বাঙালিসত্তা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে –

> বাঙালির ধ্যানে-জ্ঞানে দৈনন্দিন আচরণে
> কী যাদু করেছো তুমি কতোটা সঙ্গোপনে
> দিনের শুরু থেকে আবার দিনের অবসানে;
> জীবনের সূচনা থেকে সহস্র বিনির্মাণে
> রবির আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত মুগ্ধপ্রাণে
> বাঙালি বিশ্বমানব হবে চেতনে-মননে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সারা বিশ্বের মানবদরদি কবি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যখনই তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রতিবাদে দেশের কোথাও 'টু' শব্দটি নেই, তখনই সবকিছু ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নেমে আসেন পথে, দাঁড়ান বিক্ষুব্ধ জনতার পাশে। মানুষের ওপর অত্যাচার তাঁকে করে তোলে ক্ষুব্ধ ও অশান্ত। নির্যাতিত মানবতার প্রতি কবির অগাধ ও নির্মোহ ভালোবাসা। প্রশ্ন হতে পারে– কী করেছেন আর কীইবা দিয়েছেন কবিগুরু ? তিনি ভালোবেসেছেন প্রকৃতিকে, ভালোবেসেছেন বিশ্বমানবকে; জীবনদেবতাকে কঠিন প্রশ্নে বিদ্ধ করে সৃষ্টি করেছেন সুমহান সাহিত্য; সংকীর্ণতা ও নীচতাকে বিসর্জন দিয়ে গেয়েছেন মানবাত্মার জয়গান; হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে পরিবেশন করেছেন শান্তির ললিতবাণী। সুকুমার সেনের মতে–

> রবীন্দ্রচেতনায় প্রথমে প্রকৃতি, পরবর্তীপর্বে মানুষ এবং পরিণতিতে মানবতানির্ভর অধ্যাত্মবাদ যা আমাদের সাহিত্যকেই কেবল নয়; সমগ্রতাসহ উপমহাদেশীয় জাতিকেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্রিয় অবদান রেখে গেছেন।

সহস্র বর্ষের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিশ্রেষ্ঠের অবিসংবাদিত আসনটি যাঁর জন্যে নিত্যকাল পাতা, তিনিই বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ। তিনি সুরকার ও সংগীত শিল্পী, চিত্রী ও নৃত্য শিল্পবিদ, দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী, জননায়ক ও চিন্তানায়ক, স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক, আধ্যাত্মবাদী ঋষি ও বিশ্বপথিক। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিনেতা, বৈয়াকরণ, ছান্দসিক, বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু, ভাষাতত্ত্ববিদ, বাগ্মী প্রভৃতি। উপনিষদের আদর্শ শিক্ষাগুরুর বাণীর বাংলা রূপ –

> হে বিশ্বের অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা শোনো, আদিত্য বর্ণরূপ যিনি অন্ধকারের পরপারে রয়েছে, সেই মহান পুরুষকে জেনেছি।

মূলত রবীন্দ্রনাথের জীবন কেবল কবি জীবন নয়, এ জীবন বৃহত্তর বিশ্বে এক মানবতাবাদীর নিষ্কলুষ-নির্মোহ প্রয়াস। মানুষে মানুষে মিলন, জাতিতে জাতিতে মিলন। আত্মসুখ, স্বার্থান্ধতা ও সংকীর্ণতাবোধ দূরীকরণে রবীন্দ্রভাবনার সম্যক রূপায়ণের এইতো প্রকৃষ্ট সময়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রচর্চায় দোলাচলবৃত্তির ছাপ বিদ্যমান– পাকিস্তানামলে যারা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে, বিবৃতি দিয়ে জাতীয় কিংবা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীত বর্জনের দাবি তুলেছেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তারাই সবার আগে রবীন্দ্রনাথকে মহিমান্বিত করে আবার বই লিখেছেন। ছায়ানট-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সনজীদা খাতুন লিখেছেন–

> ঘটনাচক্রে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন বাংলাদেশের মানুষের সকল সংগ্রামের সাথী। সরকারি রোষের তোয়াক্কা রইল না আর সংস্কৃতি-অনুরাগীদের মনে। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উৎসব বাংলাদেশের মানুষের চোখ ফুটিয়ে দিল।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন–

> ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেয়া হবে।

মন্ত্রীর এই অন্তঃসারশূন্য বক্তব্যে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সময়োচিত শানিত প্রতিবাদ–

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐতিহ্য দান করেছে, তাঁর সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।

আমাদের স্বাধিকার-স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তৃত অঙ্গনে (১৯৫২ থেকে ১৯৭২ ও পরবর্তী আন্দোলনে), বাঙালির মেধা-মননে, প্রেরণা ও প্রেষণাদানে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার। বঙ্গবন্ধুর অনেক জনসভার শুরুতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'– এই গানটি পরিবেশিত হয়েছে; অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে এটি হয়ে উঠেছে জাগরণের গান, দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের আবাহন সংগীত। বঙ্গবন্ধু তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, দেশ স্বাধীন হলে এটিই হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। আজও নানা অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত হলে আমাদের হৃদয়ের গভীরে এক অবর্ণনীয় অনুরণনের সৃষ্টি হয়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের *হারামণি*'র আশীর্বাণীতে প্রতিফলিত হয়েছে কবির বিচিত্র ভাবনা–

> আমার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স– শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল, কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। কথাটা নিতান্ত সহজ কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে' শীর্ষক বাউল গানটির সুরে রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। বাংলাদেশের প্রতি অন্তর-ছোঁয়া মমতা ও গভীর ভালোবাসাসিক্ত বাণীরূপ প্রকাশে উজ্জ্বল এমন গানের চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে মর্মস্পর্শী ও বিশেষভাবে চয়ন করা এমন পঙ্‌ক্তিমালার সন্ধান আর কোথায় পাওয়া যাবে! ২০০৬ সালের *বিবিসি*'র শ্রোতাজরিপে গানখানি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা গানের মর্যাদা লাভ করে। বাংলাদেশের জন্যে এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপহার। যে কবি ছিলেন বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, জাতীয় সংগীতস্রষ্টা হিসেবে তিনি চিরকালের জন্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা উত্তরাধিকার রূপে লাভ করিনি, নানা সংকটে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁকে আমরা অর্জন করেছি। রবীন্দ্রচেতনার বৃহদংশজুড়ে আছে বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নদনদী সম্পর্কে কবি তাঁর অনুভূতি এভাবেই তুলে ধরেন–

> বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি; ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা– আমার যথার্থ বাহন– খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনো রকম– কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন, জাতিক না হলে কখনও আন্তর্জাতিক হওয়া যায় না। লন্ডন থেকে ফিরে এসে শিকড় সঞ্চার করেন শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসর-শ্রীনিকেতনের মৃত্তিকায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, বাঙালির কবি, মানুষের কবি। তাঁর কর্মপরিধি খুবই ব্যাপক, তিনি বিশ্বমানবতার কবি; বিশ্বকবি। তাঁর কাব্যে বাঙালি ও সারা বিশ্ব অপরূপ রূপ-সুষমায় মূর্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, অজ্ঞানতার চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছু নেই। শিক্ষাদানের মাধ্যমেই পল্লিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সমবায়নীতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> আমাদের দেশে সকলের চেয়ে বেশি দরকার– হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নহে, অনেক স্থানেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের কর্ম নয়। মানুষের কর্ম জয় করিবার, হার মানিবার ধর্ম নয়।

বিরাহিমপুর পরগণার শিলাইদহ ও কালীগ্রাম পরগণার পতিসরের ঠাকুর এস্টেটে রবীন্দ্রনাথের পল্লি উন্নয়ন কাজের প্রধানকর্মী ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। ২৮শে মাঘ ১৩১৪ পাবনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই উদ্যমী তরুণের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথের মাথায় তখন স্বদেশী সমাজ গড়ার পরিকল্পনা– সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে তিনি তা ব্যক্ত করেন। অভিভাষণে এবং রবীন্দ্রনাথের মুখে বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা জেনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তিনি। স্থির হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে পল্লিসেবার কাজ আরম্ভ করবেন এবং কালীমোহন সেখানে নির্ভরযোগ্য কর্মী রূপে কাজ করবেন। ১৯শে বৈশাখ ১৩১৫ কলকাতা থেকে পাঠানো চিঠিতে কবিগুরু কালীমোহনকে উপদেশ দেন–

> মঙ্গলকর্মে যতই মিলিতে পার ততই ভাল। আমার দল বলিয়া কোনো কণ্টক যেন তোমার মনে না থাকে। দেশের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নাই– এই কল্যাণ প্রেমের মিলনের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, ধর্মের দ্বারাই হইবে। চারিদিকের নিদারুণ উন্মত্ততা তোমাকে স্পর্শ না করুক– ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

২৪শে আশ্বিন কিছু কর্মীর আদর্শচ্যুতির বিষয়ে কবিগুরু সতর্ক হবার পরামর্শ দেন–

> যাহারা দেশের মঙ্গল সাধনাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। কোনো আত্মবিস্মৃত উন্মত্ততা, কোনো পাপ যদি ব্রতধারীদের মধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তিরস্কার করা কর্তব্য হইবে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসে বাংলার নদনদীসহ শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হন এবং গ্রামীণ জীবন খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। তিনি সাহিত্যে দুটি আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করেন–

> প্রথমত সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়ত নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের সঙ্গে একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষা।

শিলাইদহে হিন্দু-মুসলিম রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করে তিনি চেয়েছেন তাদের মধ্যে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে। উৎসবে তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখি বেঁধে দেন। রবীন্দ্রনাথের এই গ্রামোন্নয়ন চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে শিলাইদহে ও পতিসরে। তবে অসম্পূর্ণ কাজগুলো করতে চেয়েছেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের এক সভায় পল্লিজীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন–

> আমি যখন পদ্মা নদীর তীরে গিয়ে বাসা করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ এবং কত বড়ো অভাগা যে তারা তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এইসব গ্রামবাসী যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন গ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এইসব অসহায় হতভাগ্যদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। কীভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশা থেকে বাঁচাতে পারা যায়, সেই ভাবনা ও চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।

এ প্রসঙ্গে মানবদরদি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–

> আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানেই হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘরবাড়ি, পরিপাঠ্য, তার পাঠশালা, সাহিত্যচর্চা ও আমোদ-প্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ-নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথার অনুসরণে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ফলে গ্রামীণ ক্ষমতাবলয়ে পরিবর্তন আসে, গ্রামবাসী নিজ গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় গঠিত মণ্ডলী অথবা হিতৈষী সভা না থাকলেও তার স্থলে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে পঞ্চায়েত এবং বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সনাতন গ্রামের অচলায়তনকে আদর্শ না ভেবে এর ভেতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করে স্বশাসনের ধারণার ভেতরেই গ্রামের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন। বাইরের সাহায্য নয়, নিজেদের উদ্যোগে ও সামর্থ্যেই গ্রামবাসী নিজেদের প্রয়োজন মেটাবে এবং সমস্যা দূর করবে– এমনই তাঁর আশা। তাঁরই পরামর্শে ১৯০৪ সালের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের আলোকে তৈরি সংবিধানে সমাজের (সংগঠনের নাম) কাজের পরিধি নির্ধারিত করে দেওয়া হয় যার মধ্যে ছিল–

- পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং নদী ও খাল পুনর্খনন
- পথঘাট নির্মাণ ও সংস্কার এবং শ্মশানের উন্নতি
- কৃষি ও পশুপালন শিক্ষা এবং কৃষির জন্যে আদর্শ খামার স্থাপন
- দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্যে ধর্মগোলা স্থাপন (ধনী-গরিব সবাই সাধ্যমতো উদ্বৃত্ত চাল রাখবে এবং অভাবী কৃষকরা ধার নেবে)
- আর্থিক, সামাজিক ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংকলন
- শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা, সমাজ সদস্যদের জন্যে বালক ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন
- স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মসূচি
- সমাজের অধীনে সাধারণ পাঠাগার, ক্রীড়াস্থল ও ব্যায়ামশালা পরিচালনা এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনা
- সামাজিক আচার-আচরণে আদর্শ নীতি অনুসরণের বিধান তৈরি ও প্রয়োগ এবং সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের একজন উঁচু মাপের কবি। নোবেল পুরস্কার পাবার পর এক রাজকীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন–

> এই মণিহার আমায় নাহি সাজে, এরে ধরতে গেলে বাজে।

বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে যখন নতুন যুদ্ধের জন্য পাঁয়তারা চলতে থাকে তখন বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যান কীভাবে সম্ভাব্য যুদ্ধ ঠেকানো যায়; বিশ্বকে চিরস্থায়ী শান্তির আবাসে পরিণত করা যায়। বরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নিজের গলা থেকে মালা খুলে বিশ্বকবিকে পরিয়ে দেন। তখন বিশ্বকবির প্রভূত সুনামে দেশে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্রের প্যাকেটে বিশ্বকবির ছবি ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লাগে। তখন ভারতের একটি ব্লেডের প্যাকেটে রবীন্দ্রনাথের বিশাল দাড়িওয়ালা ছবি দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। একদল কলেজ পড়ুয়া তরুণ উৎসাহী হয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এসে কবিকে প্রণাম জানিয়ে জানতে চায়, কবিগুরুতো শেভ করেন না। অতএব ব্লেড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, অথচ ব্লেডে কবিগুরুর দাড়িওয়ালা ছবি কেন? কবিগুরু হেসে বললেন–

> কী করবো বলো, ব্লেডওয়ালারা বললো, আপনার দাড়িওয়ালা ছবি ছাপলেই আমাদের ব্লেড বেশি বিক্রি হবে।

গীতাঞ্জলির মাধ্যমে অসাধারণ বিশ্বস্বীকৃতি লাভের পরও তিনি এক আসনে বসে থেকেই খ্যাতির চর্বিতচর্বণের মধ্যে সুখের সন্ধান করেননি। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় তিনি সংকীর্ণতা দূর করে বিশ্বমানবের সাথে মিলিত হবার আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। *বলাকা* কাব্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন। মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য, সচেতন করার জন্য মানুষের ভীরুতা-কাপুরুষতা-দুর্বলতার প্রতি যে পরিমাণ ব্যঙ্গ রয়েছে, তার চেয়ে অধিক রয়েছে বেদনা। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্যে একেবারে সারকথাই নিহিত রয়েছে–

> ভালো-মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।

অপরদিকে জাপানি গবেষক কিয়োকো নিওয়া লিখেছেন–

> The more disease became, the more he was engrossed in translating Tagore's poetry.

১৯৩১ সালে প্রকাশিত বিনয় কুমার সরকারের 'যৌবন-স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রয়েছে আপ্তবাক্যসুলভ বিশেষায়িত উচ্চারণ–

> জ্যান্ত চোখে দুনিয়া ভাঙিবার ও গড়িবার শক্তি রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বধর্ম।

রবীন্দ্রনাথকে কোনো ফর্মুলায় চলবে না। 'বিনয় কুমারের বৈঠক'-এ উঠে এসেছে –

> রবীন্দ্রনাথ জীবন বা যৌবন– জীবনের ধারা, যৌবনের স্রোত– সৃষ্টিশক্তির প্রতিমূর্তি। পৃথিবীর যে কোনো জাতের লোক, যে কোনো ধর্মের লোক, যে কোনো দলের লোক, এমন একজন ঈশ্বরকে আত্মস্থ করতে সক্ষম যেটির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিউইয়র্ক ট্রিবিউন থেকে জানা যায়–

> The races of the earth are ever drawing closer together, growing ever more ready recognize and acclaim service , whoever the servitor and brother, far or near. The dream of a common brotherhood is going clearer to the vision, disillusions and rude awakenings not withstanding.

এই বৈষয়িক বিশ্বায়নে লোভী, হিংস্র ও বিভ্রান্ত দিনে-রাত্রে, আমরা কোন রবীন্দ্রনাথকে পাশে রাখব? রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়-বিমুগ্ধ উপলব্ধির পরিচয় মেলে ইন্দিরা দেবীকে লেখা *ছিন্নপত্রাবলী*র তিন সংখ্যক পত্রে–

> পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাত্রে সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়।

কবিগুরুর বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে ৭৪ সংখ্যক পত্রেও–

> এই পৃথিবীটা আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে।

৬ই অক্টোবর ১৮৯১ শিলাইদহ থেকে লেখা *ছিন্নপত্রাবলী*র ৩২ সংখ্যক পত্রে আছে–

> পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, তা মনে না করে একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট– দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

*গীতাঞ্জলি*র চার সংখ্যক রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> বিপদে মোরে রক্ষা করো
> এ নহে মোর প্রার্থনা,
> বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
>
> আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
> এ নহে মোর প্রার্থনা,
> তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

ছয় সংখ্যকে আছে–

> চেতনা আমার কল্যাণরস সরসে
> শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
> সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।

সাত সংখ্যকে আছে–

> এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
> এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে;
> এসো সকল-কর্ম-অবসানে।
> তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

৩৫ সংখ্যকে আছে–

> এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
> এসো হে পিপাসাহরা,
> এসো হে আঁখি-শীতল-করা,
> ঘনায়ে এসো মনে।

১২৭ সংখ্যকে আছে–

> রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
> পরাও যারে মণিরতন-হার –
> খেলাধুলা আনন্দ তার সকলই যায় ঘুরে,
> বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।

১৯৯২ সালের কথা। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সম্পাদনায় *রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মৃতি সংকলন* সংহতি সম্প্রীতির প্রকাশনা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্মাননা দেয় আমাকে। দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় শিক্ষানিকেতনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনার এক পর্যায়ে ভক্তিব্রত চক্রবর্তী আমার হাতে তুলে দেন *পঁচিশে বৈশাখের কবিতা* নামের একগুচ্ছ ট্যাবলয়েড। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ জাতীয় কোনো প্রকাশনা আছে কি না আমার জানা নেই। *আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ* শিরোনামে পত্রিকাটি থেকে উদ্ধৃত করছি–

- রবীন্দ্রনাথকে বার বার অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল তাঁর নিজেরই লিখন-ভঙ্গিমা, শেখার বিষয় ও প্রকরণ; এমনকি দৃষ্টিভঙ্গি। তা না হলে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত সৃষ্টিশীল থাকা সম্ভব হতো না। [কালীকৃষ্ণ গুহ]
- রবীন্দ্রনাথ আমাদের যা দিয়েছেন, যে উপভোগের সূক্ষ্মচেতনা, যে মানবীয় অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির উচ্চারণ, তা আমাদের জীবনে নানা প্রয়োজনে অনিবার্য দিশারি হয়ে আছে। [পবিত্র মুখোপাধ্যায়]
- ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য শিক্ষক বিরল। [বিজয়া মুখোপাধ্যায়]
- আশ্চর্য করে তাঁর বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও শালীনতা এবং তিনি ছিলেন মুক্ত পৃথিবীর মানুষ। এই রবীন্দ্রনাথের জন্য মানুষ নিঃশব্দে একশো বছর সন্ত্রাস বিসর্জন দিতে পারে। [শ্রীধর মুখোপাধ্যায়]

প্রান্তিক জনমানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ এভাবে তুলে ধরেছেন–

> যখন নমঃশূদ্র, ছুতার, জেলে, মুচি, ভুঁইমালি, দুলে বাউলদের কথা ও রচনা দেখি তখন আমাদের মনে হয় এমন সব কথা বলিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইতাম। ইহাই খাঁটি, শাশ্বত ও সার্বভৌম গণসাহিত্য।

গড়পড়তা প্রায় সব মানুষেরই একটি বিশেষ বয়সের পর দেহের বৃদ্ধি যেমন রুদ্ধ হয়ে যায়, তেমনই হয় মনের। কারও মন তো একেবারে পেছনের দিকে হাঁটতে থাকে। জীবিত থেকেও বেঁচে থাকার বদলে এরা মরণপ্রক্রিয়াধীন হয়ে যায়। এটিই যেন

সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। বয়সে যত তিনি বার্ধক্যের দিকে এগিয়েছেন, শরীরে জরার অধিকার বিস্তৃত হয়েছে, তাঁর মন তত যৌবনদৃপ্ত ও জরামুক্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিনিয়ত বাঁচার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ না থাকলে অনুভবের এরূপ প্রগতিমুখী রূপান্তর কারও ভেতর ঘটতে পারে না। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হলে অনুরূপ প্রবলতা ও গভীরতা নিয়েই বেঁচে থাকতে পারব, কেউই আমরা 'মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না'। বাংলাদেশের একালের অগ্রণী চিন্তাবিদ কথাসাহিত্যিক যতীন সরকারের রচনাসমগ্র থেকে রবীন্দ্র বিষয়ক চৌম্বক আলোকপাত করছি। জমিদারি তদারকি সূত্রে বাংলার দীন-দরিদ্র প্রজাকুলের সঙ্গে কবির গভীরভাবে পরিচয় ঘটে। তাই ভাইঝি ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা পত্রের একাংশে তিনি এনেছেন সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ–

> যারা বলে কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবন ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে পরতে পারবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাসনে কাটাবেই– এর কোনো পথ নেই– তারা ভারী কঠিন কথা বলে।

লোকহিত সম্পর্কে কবির গভীর আত্মোপলব্ধি–

> লোককে শিক্ষিত করে তুললে তাদের মধ্যে যে আত্মচেতনা জাগবে, সেই আত্মচেতনাই তাদের ভাগ্য-পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠবে, বাইরের কোনো হিতৈষীর আর প্রয়োজন হবে না তাদের।

রবীন্দ্রনাথ আপন অভিজ্ঞতা থেকে আমরণ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সেই শিক্ষাকে নব নব কর্মপ্রেরণার মধ্যে বাস্তব করে তুলতে চেয়েছেন। সমবায় নীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বুঝেছিলেন–

> বহুলোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করা। মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির জাগরণের মধ্য দিয়েই মনুষ্যসমাজের দুর্দশা দূর হতে পারে।

বেঁচে থাকার মন্ত্রসাধক রূপে চিহ্নিত করে *আমার রবীন্দ্র-অবলোকন*-এ যতীন সরকার লিখেছেন –

> *রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বেঁচে ছিলেন– এই বাক্যটি পড়তে গিয়ে মনের ভেতর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম। সব মানুষ তো সারা জীবন বেঁচে থাকে। আমরা জানি, যার জীবন আছে সেই বেঁচে আছে। জীবন আছে অথচ বেঁচে নেই– এমন কোনো মানুষের কথা কি আমরা ভাবতে পারি কখনো? তাহলে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বেঁচে ছিলেন– এ রকম কথার অর্থ কী দাঁড়ায়?*

সুমন বড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের অনেক মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তারই একটি হলো শিক্ষা প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের বামগালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে মাস্টার মশাই বলেছিলেন–

> এখন যেমন বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্যে কাঁদছো, দেখবে বিদ্যালয়ে না যাওয়ার জন্যে এর চেয়ে বেশি কাঁদতে হবে।

মাস্টার মশাইয়ের একথাটি সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল তাঁর জীবনে। কান্নায় জয়ী হয়ে মাস্টার মশাইয়ের চড় খেয়েও ছয় বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে বেশিদিন তিনি থাকতে পারেননি। পড়া না পারলে দুহাত প্রসারিত করে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের স্লেটগুলো হাতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। এই শাস্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ রেহাই পাননি। চলে আসেন ঠাকুরবাড়ির কাছাকাছি এক স্কুলে। এ স্কুলের ছাত্ররা ছিল অভদ্র, কথাবার্তায়ও অমার্জিত। এই স্কুলের একজন পণ্ডিতের নাম হরনাথ, ছাত্রদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতেন। পড়া না শেখার অপরাধে হরনাথ পণ্ডিত মাথা নিচু করে পিঠ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। এই শাস্তি ভোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। এ স্কুলে তিন বছর পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ ডিক্রুজ সাহেবের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হন। এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা খুব কম। যে কজন ছাত্র ছিল তারা সব সময় রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করত। ঠাট্টা-তামাসা করে নাজেহাল করত। স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। এই স্কুল ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ চলে যান সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে; আরেক স্কুল, তারপর অন্য স্কুলে। এভাবে স্কুল বদলানো ছেলেটির কাছে স্কুলজীবন মোটেই সুখকর ছিল না। বেশিদিন কোনো স্কুলে টিকতে পারেননি। স্কুল ছিল তাঁর কাছে জেলখানার মতো। আদরের ছেলে রবিকে বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করা হলো। পত্রিকার নিয়মিত পাঠক রূপে শুধু তা পড়েই শেষ না নামিয়ে বাবার কাছ থেকে শেখা ফর্মুলানুসারে সংগ্রহ করে তা প্রয়োজন মাফিক কাজে লাগাবার অভ্যাসটুকু গড়ে ওঠে ছেলেবেলায়ই।

প্রথম আলোর *অন্য আলোয়* প্রকাশিত নির্মলেন্দু গুণের 'আমার রবীন্দ্রনাথ' থেকে এবার আলোকপাত করছি–

> ১৯৬১ সালে বারহাট্টা ক্লাবে আমাদের স্কুলশিক্ষক যতীন সরকার রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। নাইন কি টেনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি পড়ে আমি একটি পুরস্কার পেয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে কতভাবে গোচরে-অগোচরে আমাদের প্রভাবিত করেছেন, সেটি বলে শেষ করা যায় না। আমার মনে হলো যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ধারণ করার জন্য বোধ হয় একটু পরিপক্বতা দরকার। ফলে যতদিন যেতে থাকলো আমি ততদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে থাকলাম। তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতে শুরু করলাম। একটা পর্যায়ে মনে হলো, এর জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ি। তাঁকে পড়তে পড়তে শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য– জীবনের নানা স্তর অতিক্রম করি। চিরকালীনতার বিচারে আমাদের বুকের গভীরে রবীন্দ্রনাথের ছায়াই আমরা আবিষ্কার করতে পারবো। সব সুন্দরের মধ্যেই তাঁর একটা ছায়া আছে।

জ্যঁ ক্রিস্তফ-এর রমাঁ রলাঁর অনবদ্য বর্ণনায় যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই, তাঁর আলোকচিত্র, আত্মপ্রতিকৃতি বা ভাস্কর্যে এত অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন দেখা করতে। সঙ্গে তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পরনে ভারতীয় পোশাক। কালো মখমলের উঁচু টুপি আর ছাইরঙের লম্বা জোব্বা। অতি মাত্রায় সুন্দর। লম্বা মুখখানা সুন্দর সুষম। খাঁটি আর্যজনোচিত। সেই টকটকে রঙের সোনালি রৌদ্রমাখা চেহারায় জীবনের দান যে উজ্জ্বল বাদামি দুই চোখ, তাতে সুন্দর চোখের পাতার ছায়া পড়েছে। খাড়া নাক। সাদাগোঁফের নিচে

> হাসিমুখ। রেশমের মতো দাড়ি তিনভাগে, ছুঁচালো দুই সাদাভাগের মধ্যের ভাগটা তখনও কালো। প্রচুর প্রশান্ত আনন্দ গোটা মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চেহারা অনেকটা সেই প্রাচ্যঋষির মতো।

শাসকশ্রেণির অন্যায়ের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করে একাত্ম হয়ে যান অত্যাচারিত শাসিতদের সঙ্গে। প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই স্থাপন করেন বাঁচার মতো বাঁচার দৃষ্টান্ত; তাঁর 'ভাঙার গানে' ধ্বনিত হয় সৃজনের সুর ও সার্থকভাবে বেঁচে থাকার মন্ত্র। চরম আত্মপ্রত্যয়ী কবির জীবন-সায়াহ্নে এসেও যেন প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা–

> মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই ঘোষণার মাত্র চার মাস পরই ঘটে কবির মহাপ্রয়াণ। বিশ্বাত্মবোধের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীর বাঙালির মানসগঠনে এভাবেই ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা জুগিয়ে চলেছেন। মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। সীমার মাঝে অসীমের মিলন সাধনই ছিল তাঁর মূলসুর। তিনি আমাদের প্রতিদিনের সূর্য। সেই আলোকে আলোকিত হয় আমাদের অন্তর, আমাদের গৃহ, আমাদের দেশ। বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নে রবীন্দ্রসাহিত্যের কথা –

> Poetry is the elemental stuff in Tagore, and his prose is one of its manifestations.

ভাষাবিজ্ঞানী মনসুর মুসার বিশ্লেষণ–

> রবীন্দ্রনাথের মূল্যবোধের মাপকাঠিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাদের অতি প্রাযুক্তিক উন্নয়ন মানুষকে যন্ত্রের কাছে অবনত হওয়ার কথা বলছে। সৃজনশীলতার পরিবর্তে অনুকরণকে গুরুত্ব দিচ্ছে। উপলব্ধির চেয়ে উপচিকীর্ষাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সভ্যতার সংঘাতের চেয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটের মর্মার্থ অনুধাবন করতে হলে রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার পুনর্পঠন প্রয়োজন।

আজ বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী মহামারি করোনা যখন মানবজাতির চেতনায় নাড়া দিয়েছে তখন বাঙালি জাতির মানসগঠন ও সংকটোত্তরণে রবীন্দ্রভাবনা কতখানি সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম তা আমাদের চেতনার অনুরণনে প্রতিফলিত হবে বলে মনে করি। বর্তমান সদাশয় সরকার রবীন্দ্রভাবনাপ্রসূত জাতির পিতার সুদীপ্ত চেতনার অনুরণনে তৃণমূল পর্যায়ে পুনর্গঠন-পুনর্বাসনে নিরলস কাজ করে চলেছেন।

তথ্যসূত্র

১. নির্মলেন্দু গুণ, *আমার রবীন্দ্রনাথ*, *অন্য আলো*, প্রথম আলো, ৩রা মে ২০১৯

২. গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমি

৩. *দেশ*, ১৩৯৯, শারদীয় সংখ্যা

৪. *পঁচিশে বৈশাখের কবিতা*, বর্ষ ২১, বৈশাখ ১৩৯৪, কলি-৫৩

৫. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক*

৬. মনসুর মুসা, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সভ্যতার সংকট উপলব্ধি*, ১৪০৯

৭. মাসিক *উত্তরাধিকার*, বৈশাখ ১৪১৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৮. যতীন সরকার, *রচনাসমগ্র* (১, ২, ৫, ৬), অনুপম প্রকাশনী

৯. *রবীন্দ্রজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি* (বাং-ইং সংস্করণ), আশীর্বাদ, ২০১০

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পল্লী-প্রকৃতি*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সমবায় নীতি*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড

১৩. *শব্দঘর*, ঢাকা, মে ২০১৭ ও মে ২০১৮

১৪. *সচিত্র বাংলাদেশ*, মে ২০১৫, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১৫. সংহতি সম্প্রীতি, *রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মৃতি সংকলন*, ১৯৯২

১৬. সুব্রত কুমার দাস, *রবীন্দ্রনাথ : কম-জানা, অজানা, গদ্যপদ্য*, ২০১১

১৭. সাইফুদ্দীন চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গের কিছু কথা*, বাংলা একাডেমি, ২০০১

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ: লেখক-গবেষক-সংস্কৃতি সংগঠক এবং প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শিশুকুঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঝিনাইদহ, banglabangalibangladesh5271@gmail.com

নজরুলের নাটক

আতিক আজিজ

কিশোর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আশপাশের পল্লির লেটোদলের পালা রচয়িতা। গানে সুর যোজনা করতে এবং প্রতিপক্ষের পালটা জবাব দিতেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রথম আর্বিভাব গ্রাম্য যাত্রাদলের কবিয়াল রূপে। যাত্রানাট্য, কথকতা ও হাফ-আখড়াইর ঢঙে আসানসোল অঞ্চলে লেটোগানের প্রচলন ছিল। নৃত্যগীত সহকারে সেই গীতিনাট্যের অভিনয় হতো। তর্জা-খেউড়-কবিগানের মতো কখনও কখনও আসরে দুই দলে প্রতিযোগিতাও চলত। তাঁর সেসময়ের রচনা: *চাষার সঙ*, *ঠগপুরের সঙ*, *মেঘনাদবধ*, *শকুনিবধ*, *দাতাকর্ণ*, *রাজপুত্র*, *কবি কালিদাস*, *আকবর বাদশা* প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনে তাঁর কবি চরিত্রের আদিম রূপ লক্ষ করা যেতে পারে। মজলিশের হইচই কোলাহলের মধ্যে চিত্তাকর্ষক কবিতা ও গান রচনা করার দুর্লভ ক্ষমতা তিনি সেই কৈশোরের সাধনা থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। নজরুলের প্রতিভার জাদুস্পর্শে লেটোগানের পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় এমনই অভিনবত্ব ঘটল যে, তারই চমৎকারিত্বে শ্রোতামণ্ডলী সমধিক মুগ্ধ হলো। নজরুলের গানে ছিল মধুর সুরের আবেদন, সংলাপে ছিল বিচিত্র ভাবের ব্যঞ্জনা; তাই এক অপরাজেয় গীতিনাট্যকার রূপে অচিরেই তাঁর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পালাগানের পদ্ধতিতে নজরুল তাঁর লেটোগান শুরু করতেন স্তোত্র দিয়ে। তাঁর রচিত একটি বন্দনা গীতি–

সর্বপ্রথম বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারী'তালা।
তারপরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে'আলা ॥
সকল পীর আর দরবেশ কুলে
সকল গুরুর চরণ-মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে।
দোওয়া করো তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজালা।
সর্বপ্রথম বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারী'তালা ॥
তোমারই ওগো খোদা'তালা!!

তৎকালে তর্জা-পাঁচালিতে আরবি-ফারসি-উর্দু-ইংরেজির মিশেল দেওয়া বাহাদুরির পরিচায়ক ছিল। বিশেষত সেই মিশ্র ভাষার ব্যবহারে প্রতিপক্ষের পালটা জবাবও হতো উপভোগ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী ছড়াদার ও পাল্লাদারকে লক্ষ করে নজরুলের একটি ব্যঙ্গগীতি–

ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার
মস্ত বড় Monkey like
দেখতে ভারী cad.
গড়হশবু লড়বে বাবর-কা সাখ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত্,
জানে না ও ছোট্ট হলেও
হাম্ ভি Lion lad.
শোনো ও ভাই Brother দোহারগণ!
মচ্ছর-ছানা সব করেছে পণ
গান গাহিবে আসর মাঝে,
খবর বড় Sad
ও ভাই খবর বড় Sad

বায়োপ্রাচীন প্রতিযোগীকে কিছুমাত্র পরোয়া না করে নজরুল নিজেকে বলেন, ছোট্ট হলেও Lion lad সিংহ শিশু। সেই ১০/১২ বছর বয়সেই তাঁর এই আশ্চর্য আত্মপ্রত্যয় তাঁকে করেছে অস্থির ও উদাস। জন্মভূমির সৌন্দর্যে তাঁর অন্তর যেমন হয়েছে অভিভূত, মানবিক অনুভূমিতেও তাঁর চিত্ত দিয়েছে সেরূপ সাড়া।

নজরুলের সকল বাল্য-রচনাতেই দেখা যায়, এদেশের পৌরাণিক কাহিনি, পালাগান, কবিগান, কীর্তন, পাঁচালি প্রভৃতির বিষয়বস্তু ও রচনা-রীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রচুর। প্রাচীন গ্রিকেরা Dionysus-এর লীলাকাহিনি প্রচার করতে গিয়ে নাট্যকলার সূত্রপাত করেন; প্রদেশেও ধর্মকাহিনি অবলম্বন করেই রামলীলা, কৃষ্ণযাত্রা ও ইমাম-যাত্রার প্রচলন হয়। প্রথম যুগের নাট্যকারেরা ধর্মভীতু দর্শকদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যেই পৌরাণিক কাহিনি আশ্রয় করেন; এই একই কারণে নজরুলের বাল্য-রচনাতেও দেখি পৌরাণিকীর প্রভাব।

রামপ্রসাদের কীর্তনে আছে কালীমাহাত্ম্যের বর্ণনা; কিন্তু নজরুল নাটিকাটির পরিকল্পনা করেন ইসলামের ভাবাদর্শ ও অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে। 'চাষীর গীত' দুটিতে বিধৃত রয়েছে তার মূল সুর। দুনিয়ার জমি যথাবিধি আবাদ করে লাভ হবে ঐহিক জীবনধারণের বিবিধ ফসল, আর দেহের জমিতে চাষ করে লাভ হবে আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের বিচিত্র সম্পদ। শেষোক্ত তত্ত্বটি সুব্যক্ত হয়েছে এই গানটিতে–

চাষ করো দেহ জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে ॥
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সামালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে

চিন্তা কি হে এই ভবেতে ॥
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেলা তুই বিধি-মতে,
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সম্মুখেতে ॥
নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিরাত যাহার
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জান্নাত তাহাতে ॥
যদি ভালো হয় হে জমি
হজ্ব যাকাতে লাগাও তুমি
আরো সুখে থাকবে তুমি-
কয় নজরুল ইসলামেতে ॥

রাজপুত্র নাটকে বলেছেন–

অসংখ্য নগর গ্রাম
দুর্গ গুহা পর্বতাদি
কত নদ নদী
দেখিলাম, কিন্তু নিরবধি
স্বদেশ জাগিছে এ অন্তরে।

তাঁর *শকুনিবধ* নাটকে পুত্রশোকাতুর পিতার অনুশোচনা হয়েছে অন্তরস্পর্শী।

কোথা গেলি প্রিয় উলুক পুত্রধন!
কি দোষ অসময়ে আমারে
করিলি রে বর্জন?

কবির কাঁচা লেখনীতেই তরুণ প্রেমের ছলনা রূপায়িত হয়েছে চটুল ভঙ্গিতে–

বুঝলাম নাতো এতদিনে
যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয়
আমারে বল না হে ॥
তোমার হিয়া কঠিন অতি
জাননা শ্যাম প্রেমের রীতি
তাই নিভালে প্রেমের বাতি
আর বাতি জ্বেল না হে ॥
এইরূপে কত কামিনী
মজায়েছেন গুণ মণি
কপাল-দোষে বিরহিনী
তোমার আর হ'ল না হে ॥
বিরহ- জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়ো না বাঁকা শ্যাম,
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম
মেরো না ললনা হে।

আশ্চর্য যে, দেহতত্ত্বমূলক মাল-মশলা নিয়ে তিনি সেই বাল্যবয়সেই প্রণয়ন করেন *চাষার সঙ* নামে এক গীতিবহুল প্রতীকী নাটিকা। অষ্টাদশ শতকের সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের সুপ্রসিদ্ধ গান–

মন তুমি কৃষি-কাজ জান না
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা॥

২.

কাজী নজরুল ইসলামের কল্পদৃষ্টিতে ভাবের বিরাট দিগন্ত যায় খুলে। তিনি কথার সূত্রে গ্রথিত করেন কল্পনার বিচিত্র কুসুম। অজস্র কবিতা ও গানে, গল্প ও উপন্যাসে বাণীর কণ্ঠহার খচিত করেন। করাচিতে পল্টনে যোগ দিয়ে নজরুল উপলব্ধি করেন যে, বিপুলা পৃথিবী এবং কাল নিরবধি। কিন্তু *দৈনিক নবযুগে* অর্ধ-সাপ্তাহিক *ধূমকেতু* ও সাপ্তাহিক *লাঙ্গল* পরিচালনের পর তাঁর উদ্দামতা যখন মন্দীভূত, নয়নে লেগেছে শান্ত সৌন্দর্যের ঘোর, তখন তিনি কান পেতে শুনেন নাটরাজের নৃত্যনিক্কণ, তারই ছন্দ তালে জন্ম নেয় তার *ঝিলিমিলি* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গীতিবহুল নাটিকাগুলো। ১৩৩৪ আষাঢ়ের *নওরোজ* পত্রিকায় *ঝিলিমিলি* প্রথম প্রকাশিত হয়। *সেতুবন্ধ* নাটিকাটির প্রথম দুটি দৃশ্য ১৩৩৪ শ্রাবণের *নওরোজ*-এ বেরিয়েছিল 'সারা ব্রীজ' শিরোনামে। 'শিল্পী' ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক *সওগাতে*।

নজরুলের *ঝিলিমিলি* রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর* নাটিকাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। *ডাকঘর* প্রতীকী (Symbolic) নাটক; তাতে মেটারলিঙ্কের ধরনের বিশ্বানুভূতির রূপায়ণ লক্ষণীয়। রূপক কবিতার মতোই প্রতীকী নাটক মনে জাগায় অসীমের জন্য পিপাসা, সংসারের প্রতি বীতরাগ। পুরাতন ধর্মের ভগ্নাবশেষের ওপর নতুন আধ্যাত্মবোধের প্রলেপ ছড়িয়ে আধুনিক চিত্তকে বিশ্বানুপ্রবিষ্ট করবার মহৎ প্রেরণা এ ধরনের রচনার মূলে প্রবল। *ডাকঘরে* রয়েছে বিশ্বের আনন্দের মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করবার প্রয়াস, অপরূপের জন্য অন্তরের আকুলতা। কিন্তু নজরুল যৌবনের কবি; পৃথিবী ও প্রকৃতির স্তন্যে লালিত মানব-দুলালির জন্যে তাঁর কামনা তৃপ্তিহীন। তাই রবীন্দ্রনাথের 'অমল' ও 'সুধা' নজরুলের হাতে হয়েছে 'হাবিব' ও 'ফিরোজা'; 'মাধব দত্ত' হয়েছে 'মীর্জা সাহেব'। অমল তার চিত্তকে পৃথিবীর দিকে প্রসারিত করতে সে বাতায়ন দিয়ে নিজের কল্পনাকে দেয় বিশ্বের পথে মুক্ত করে। মাধব দত্ত জানায় জানালা খোলায় আপত্তি। আর ফিরোজার পূর্ব জানালা খুলতে দেন না তার বাপ মীর্জা সাহেব– সেই জানালার পথে হাবিবের সঙ্গে তার মনের মালাবদল যাতে না হতে পারে সেজন্যই তিনি বাদ সাধছেন।

ঝিলিমিলি'র দ্বিতীয় দৃশ্য স্বপ্নপুরী। সেই পুরীতে সপ্তমী চাঁদের তরীতে হাবিব ও ফিরোজার কল্প মিলন। হাবিব বলছে, এখানে আসতে হয় শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া' হয়ে। এখানে নর-নারী অনামিক। এ লোকে নর-নারীর পরিচয় সংকেত শুধু 'প্রিয়' আর 'প্রিয়া'। এখানে ডাকতে হয় শুধু 'প্রিয়তম' বলে। সেই স্বপ্নলোকে ফিরোজার মনে হচ্ছে যেন 'হাবিব নিখিল পুরুষ', সে 'যেন অনন্তকাল ধরে কাঁদছে'। আর হাবিব দেখছে ফিরোজার 'মুখে আজ নিখিল বিরহিনী ভিড় করেছে।' প্রায় এক বছর আগে (১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই) নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'অনামিকা' কবিতায় লীলাবাদী দর্শনের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন; কিন্তু এখানে আভাস দিয়েছেন যে, এরূপ লীলা-কল্পনা শুধু স্বপ্নঘোরেই সম্ভব।

তৃতীয় দৃশ্যে বাস্তব পৃথিবী থেকে ফিরোজা চিরবিদায় নিয়ে গেল তার 'পূর্ব জানালা দিয়ে' হাবিবের 'জানালার ঝিকিমিলি খুলতে।' মৃত্যুর পথে হলো তার অন্তিম অভিসার। আর *ডাকঘরের* তৃতীয় দৃশ্যে দেখি, অমল যখন রাজদূতের মারফত পেল 'মহারাজের' আসবার খবর, তখন অপরূপের স্বপ্নে হলো সে বিভোর। তখন সুধা এল 'ওর জন্য ফুল' নিয়ে, বললো রাজ-কবিরাজকে, অমল জাগলে 'ওকে একটি কথা কানে কানে বলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।' সুধার একথা আমাদের হৃদয়ে বুলিয়ে দেয় কর্পুরের

মৃদু সুরভি, আনন্দের একটু ছোঁয়া। কিন্তু ফিরোজা যখন 'অস্ত-চাঁদের' তরীতে দিয়েছে পাড়ি, তখন হাবিবের মধ্যে দেখি ঝড়ের উদ্দামতা। এই উদ্দামতা পৃথিবীর প্রেমোন্মাদ তরুণের।

নজরুলের *সেতুবন্ধ* রূপক নাট্য। রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারার* সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। *মুক্তধারা*'র ভৈরবপন্থির গানটির প্রভাব *সেতুবন্ধের* শেষ গানটিতে সুস্পষ্ট; তবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> জয় বন্ধন-ছেদন
> তিমির হৃদ-বিদারণ

আর নজরুল বলেছেন,

> এস উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
> বজ্রাগ্নির দাহ ল'য়ে রোষ-নয়নে।

এ দুটি নাটকের theme বিচার করলেও নজরুলের স্বকীয়ত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নেই। পার্থক্য মূল পরিকল্পনায়। *সেতুবন্ধ* নাটকে যে সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে, সে হচ্ছে প্রকৃতির জড়শক্তির সঙ্গে মানুষের তৈরি যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জড়শক্তির সংঘাত। মানুষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে কাঠ, ইট, সুরকি, পাথর, লোহা, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহায্যে পদ্মার ওপর দিয়ে তৈরি করেছে 'সারা ব্রীজ', সেই সেতু একদা ধসে গিয়েছিল মেঘ, বায়ু, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, নদী, তরঙ্গ, বালুকণা প্রভৃতির সম্মিলিত আক্রমণে। নজরুল ধারণা করেছেন যে, প্রকৃতির শক্তিকে যন্ত্রশক্তির দ্বারা পরাভূত করতে গিয়ে মানুষের আবিষ্কার-বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটবে বার বার। কিন্তু তাঁর এ অভিমত মেনে নেওয়া মুশকিল। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে সারা ব্রিজ স্থায়ী বন্ধন স্বীকার করেছে, পদ্মার আক্রোশ হয়েছে ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারায়* রূপায়িত হয়েছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর সংঘাত– অভিজাত শোষক শক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত শোষিত শক্তির সংঘাত। উত্তরকুটের আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যে শিবতরাইয়ের ঝরনার পানি বন্ধ করে যন্ত্রশক্তির প্রতিষ্ঠা; উত্তরকুটের যুবরাজ অভিজিতের জন্ম শিবতরাইয়েরই ঝরনাতলে, তাই সে-ই পারল আত্মবিসর্জনের দ্বারা যন্ত্ররাজের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে শিবতরাইয়ের অধিবাসীদের মুক্তি দিতে। এখানে চিত্রিত হয়েছে আত্মার বলে বলীয়ান শোষিত শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে যন্ত্রবলে বলীয়ান শোষক শক্তির পরাজয়। যন্ত্রের গঠনে যেখানে রয়েছে ত্রুটি, সেই দুর্বল স্থানটিতে আঘাত করে অভিজিত করল যন্ত্ররাজের ষড়যন্ত্র বিফল। কিন্তু যন্ত্র যে দিন দিন ত্রুটিহীন হচ্ছে। কাজেই এপথে অভিজিতের দল যন্ত্ররাজকে কাবু করতে না-ও পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার এ দুর্বলতা ভেবে দেখেননি, যেমন দেখেননি নজরুল প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার অসীম সম্ভাবনা।

ঝিলিমিলি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ নাটিকা *ভূতের ভয়*। *ভূতদল* স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছে, দেবকুল তাদের রাজ্য থেকে ভূত ভাগাবার মন্ত্র উদ্ভাবন করেছে 'মাভৈঃ'– ভয়কে জয় করবার 'মাভৈঃ বাণী' কিন্তু বিপ্লব কুমার এসে প্রচার করল অগ্নি মন্ত্র। গান্ধীজীর নিষ্ক্রীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মোকাবিলার বিপ্লববাদীর সক্রিয় আন্দোলনের মূল্যমান এই নাটিকাটিতে রূপকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। 'ধ্বংসের পূজারি দল নব সৃষ্টির ধেয়ানি' হয়ে প্রেম-প্রীতি নিয়ে যখন আবির্ভূত হবে, তখনই আসবে মুক্তি, বিপ্লবের সাধনা হবে সার্থক– এ পরম তত্ত্বটির পরিবেশনা নাটিকাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। নজরুলের দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলোরও অন্তর্নিহিত কথা এই বিপ্লবের জন্য বিপ্লব নয়, নব সৃষ্টির জন্য, মহৎ মানব কল্যাণের জন্য চাই আমূল পরিবর্তন।

উপর্যুক্ত চারটি রূপক নাটিকারই পরিসর স্বল্প-পরিমিত; এগুলো রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের উপযোগী করে লিখিত নয়, বেতারে ও মজলিশে অভিনীত হওয়ারই উপযোগী।

৩.

নজরুলের *শিল্পী* নাটিকাটিও রূপক। চিত্রকর 'শিরাজ', চির-সুন্দরের জন্য তার নিত্য নব-তৃষা। তার সহধর্মিণী 'লায়লী' তাকে চায় মানুষ রূপে ও স্বামীরূপেও পেতে; না পেরে তার মনে জাগে অভিমান, শিরাজ চায় লায়লী হোক তার ধ্যানলোকের মানসী, তার শিল্পের প্রেরণা। লায়লী চায় শিরাজের কাছে বধূ হওয়ার আনন্দ, পুত্র-কন্যার জননী হওয়ার গৌরব। এই দুই বিরুদ্ধ-ভাবের দ্বন্দ্ব দিয়ে নাটিকাটির সূচনা। প্রথম দৃশ্যের শেষে 'চিত্রা'র আবির্ভাব, এবং চিত্রাকে নিয়ে শিরাজের অন্তর্ধান। 'চিত্রা' শিরাজের শিল্পী-মানসের আনন্দ লক্ষ্মী, প্রেরণা লক্ষ্মী।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, লায়লী পিত্রালয়ে গিয়ে দীর্ঘ বিরহকে অমৃতময় করে তুলেছে শিরাজের ছবি এঁকে, শিল্পের সাধনা করে, নিজে শিল্পী হয়ে। তাতে কল্পনা সুন্দরের শুভাশীষ সে লাভ করল; কিন্তু স্বামী-সান্নিধ্যে আসতেই তার মন উঠল হাহাকার করে।

তৃতীয় দৃশ্যে, চিত্রাও চাইছে বধূ হতে। শিরাজ বলছে,

'শিল্পী চাঁদ পাখী– এরা আর সব বোঝে, শুধু বোঝে না বেদনা।'

'আমি হৃদয়হীন নির্বোধ উদাসীন শিল্পী।' জবাবে চিত্রা বলছে,

'তুমি পাষাণ অ্যাপোলো।'

চিত্রা নিলো বিদায়। কিন্তু সেই বিদায়ের ক্ষণে শিল্পীর চোখে এল অশ্রু, প্রথম অশ্রু। তাকে উপহার দিলো তার ছবি আঁকবার তুলি; বলল, 'এই তুলি আর না,' এবার তার যাত্রা নূতন পথে 'যে পথে পৃথিবীর কোটি কোটি ধূলিলিপ্ত সন্তান নিত্যকাল ধরে চলেছে সেই দুঃখের, সেই বেদনার পথে।' বলা বাহুল্য যে, সার্থক শিল্পী হওয়ার পথেই তার সেই যাত্রা।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৩৫ সালে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন সংগীতাচার্য রূপে। অভিনয়ের নাটকগুলোর গান রচনা এবং গানে সুর যোজনা ছিল তাঁর কাজ। সে সময় রেডিও-আসরে ও গ্রামোফোন রেকর্ডে সুরস্রষ্টা রূপে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি। মনোমোহনে অভিনীত শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জাহাঙ্গীর* নাটকের জন্য মোগল রঙমহলার রূপ কুমারীদের এই গানটি লিখে দেন নজরুল–

> রঙ্ নহলে গো রঙ্ মশাল মোরা
> আমরা রূপের দীপালি।
> রূপের কাননে আমরা ফুল-দল
> কুন্দ মল্লিকা শেফালী।

এই একটি গানেই নাটকটির সাংগীতিক মর্যাদা এতখানি বৃদ্ধি পায় যে, দর্শকদের ভিড় বেড়ে যায়। শ্রীমন্মথ রায়ের *মহুয়া* ও *কারাগার*, শ্রী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *সিরাজ-উদ-দৌলা* প্রভৃতি বহু নাটকের গান নজরুলের রচনা। *সিরাজ-উদ-দৌলা* নাটকের এই গানটি সেদিন কণ্ঠে গীত হয়েছে–

পলাশী! হায় পলাশী !
এঁকে দিলি তুই জননীর মুখে
কলঙ্ক কালিমারাশি।
আত্মঘাতী স্বজাতির মাখিয়া রুধির কুঙ্কুম
তোর প্রান্তরে ফুটে' মরে গেল পলাশ কুসুম
তোর সংগাত তীরে পলাশ-সঙ্কাশ
সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি।

৪.

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসেই নজরুলের নাট্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৩৩৬ আষাঢ়ের *কল্লোল* এই 'সাহিত্য-সংবাদ' পরিবেশন করে যে, নজরুল এতখানি 'অপেয়া' লিখেছেন; প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন *মরুতৃষা*, পরে বদলে নামকরণ করেছেন *আলেয়া*, সম্ভবত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হবার জন্য। কিন্তু কার্যত *আলেয়া* অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে; প্রথম অভিনয় রঞ্জনী : ৩রা পৌষ ১৩৩৮।

আলেয়া প্রতীকী গীতিনাট্য। ভূমিকায় কবি বলেন,

'এই ধূলির ধরায় প্রেম-ভালোবাসা-আলেয়ার আলো। সিক্ত

হৃদয়ের জলাভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হতে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

নর-নারীর হৃদয়ের রহস্য অপূর্ব কবিময় ভাষার এই গীতিনাট্যে রূপায়িত হয়েছে।

মীনকেতু নায়ক, জয়ন্তী নায়িকা। মীনকেতু রূপসুন্দর যৌবনের প্রতীক। জয়ন্তী– যে তেজে যে শক্তিতে নারী রানি হয়, নারীর সেই তেজ, সেই শক্তি। 'প্রস্তাবনা'তে প্রজাপতিদ্বয় গান গাইছে–

সেই সে পথে চলি
যে পথে আলেয়া-ছল।
মোরা চাহি না ক প্রেম,
চাহি মোহিনী মায়ায়।

এসব গানের ইঙ্গিত থেকে সূচনাতেই মনে জাগে যে, মিলনের সার্থকতা নয়, স্বপ্ন কুহেলিকা সৃষ্টিই নাটকখানির উদ্দেশ্য। মীনকেতুর রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে জয়ন্তী বিজয় অভিযান করেছে খবর পেয়ে মীনকেতু বলছে, 'ও মরুচারিণী মায়াবিনী, চিরকালের চিরবিজয়িনী! রাজ্যের সকলকে এখনই বলে দাও, আজ তাদের রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজ্যলক্ষ্মী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে।' প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তিতে দেখি, যৌবনের এই প্রথম পরাজয়ের পরম গুণকে বরণ করতে 'মেঘ-বাদলের নৃত্যোৎসব', প্রকৃতির রাজ্যে উৎসবের ঘটা।

জয়ন্তীর মনের আদিম প্রবৃত্তিসমূহের প্রতীক 'উগ্রাদিত্য', তার সেনাপতি। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, জয়ন্তীর আপন আদিম বৃত্তিগুলোর ওপর এমনই প্রভাব যে, ঐ উগ্রাদিত্য তার 'কাছে দিব্যি শান্ত হয়ে' থাকে। এই মাহাত্ম্য গুণেই জয়ন্তীরা রানি– পৃথিবীর মীনকেতুদের হৃদয়রাজ্যের রানি হওয়ার যোগ্য।

কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে দেখা যাচ্ছে, জয়ন্তীকে একান্তভাবে পেতে চাইছে দুই বিরোধী শক্তি, নারীর আদিম প্রবৃত্তিগুলোর প্রতীক উগ্রাদিত্য এবং মদনকুমার বলছে,

নিখিল পুরুষের প্রতীক মীনকেতু। এই দ্বন্দ্বে মীনকেতুর পৌরুষের আঘাতে উগ্রাদিত্যের পতন হলো। তখন জয়ন্তী বলছে, 'এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না; তাই বন্ধু বিদায়! যদি আমার মনে আবার সেই ক্ষুধা জাগে, যদি ঐ উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়, কল্যাণীর সিঁথিতে সিঁদুর ওঠে, তবে আমি আবার আসব।'

অতঃপর পড়েছে 'যবনিকা'।

কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে, জয়ন্তীরা যখন সর্বাংশে প্রবৃত্তিরূপিণী হয়ে মত্তদর্পে একাধিপত্য দাবি করে, তখন সেই কুৎসিত উগ্রাদিত্যটা সুন্দর পুরুষের তীর আঘাতে অন্তর্ধান করে উগ্রাদিত্যটাকে সম্পূর্ণ বশীভূত রাখতে পারে যে জয়ন্তীরা, তারাই হয় মীনকেতুদের হৃদয় রানি– তারা যেমন নর্মবধূ, তেমনই মর্মবধূ, যেমন কামনার সহচরী তেমনই আত্মার আত্মীয়া। পুরুষের পৌরুষ এবং নারী প্রবৃত্তি, এ দুইয়ের ভূমিকা নাটকটিতে অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করেছে। মুহূর্তের জন্য প্রবৃত্তির ঐশ্বর্য হতে কোনো নারী সঙ্গী হয় রিক্তা, সেই শক্তির পুনরাবির্ভাবে নারী হয় আবার পুরুষের জীবন লক্ষ্মী।

নজরুল শুধু রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের নাটকেরই নয়, *চৌরংগী*, *দিকশূল*, *নন্দিনী*, *চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন* প্রভৃতি বহু বাণীচিত্রেও গান রচনা করেছেন। তিনি *ধ্রুব* ছায়াচিত্রে 'নরদের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁর *বিদ্যাপতি* ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। বিদ্যাপতি ও অনুরাধা, রাজা শিবসিংহ ও রানি লছমী, মৈথিলী পদাবলির এ সকল সুপরিচিত চরিত্র আশ্রয় করে তাতে যে বিপুল সৌন্দর্য ও উচ্ছল রসের সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অতুলনীয়।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে নজরুলের নাট্যচিত্র *সাপুড়ে* প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই চিত্রকাহিনিটির পরিকল্পনায় *মহুয়া*, *মঞ্জুর মা* ও *পীরবাতাসী*– এ তিনটি পালাগীতির প্রভাব প্রচুর। এর নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীমতী কানন দেবী; তাঁর সুধাবর্ষী কণ্ঠে গীত হয়ে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে নজরুলের এ দুটি গান–

১। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ;
২। কথা কইবে না বউ।

নজরুলের এ দুটি চিত্রবাণী গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, কলকাতার কোনো মাসিকপত্রে 'বিদ্যাপতির চিত্রকাহিনি' প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্যাপতি' হিজ মাস্টার্স ভয়েস্ কোম্পানি রেকর্ড করেছিলেন। নজরুলের *পুতুলের বিয়ে* ছোটো মেয়েদের গীতিনাটিকা, সেটি গ্রন্থবদ্ধ ও রেকর্ড হয়েছে। তাঁর 'বিয়ে বাড়ী', 'শ্রীমন্ত' ও 'প্রীতি-উপহার' রেকর্ড হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। 'ঈদুলফেতর' বেতার নাটিকা ; এই নাটিকার নায়ক মাহতাবের উক্তিতে আছে নজরুলের পরিণত বয়সের আধ্যাত্মকথার প্রতিধ্বনি।

৫.

নজরুলের *মধুমালা* গীতিনাট্যের রচনাকাল অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, ডিসেম্বর ১৯৩৭। কিন্তু নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয় রচনার প্রায় আট বছর পরে ১৯৪৫ সালে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এর আগে অনেক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছে; কিন্তু এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য দ্বিতীয়টি হয়নি।

মদনকুমার-মধুমালার কাহিনি সুপরিচিত। কিন্তু নজরুল ইসলাম এখানে কাহিনিটিকে গীতাভিনয়ের প্রয়োজনে কিছুটা নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* 'মদনকুমার মধুমালার পালা' আছে; যে পালার নায়ক–

উজানি নগরে ঘর নামে রাজ্য দণ্ডধর
তার পুত্র মদনকুমার

নায়িকা নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে,

কাঞ্চন নামেতে ঘর
তার রাজ্য হীরাধর
আমি তার কন্যা মধুমালা।

নজরুলের নাটকখানিতে পাত্র-পাত্রীর পরিচয়: 'প্রাগজোতিষপুরের গারো পর্বতের কাছে কাঞ্চননগর, সে দেশের অধিপতি দণ্ডধর,' তার পুত্র মদনকুমার। 'চারিদিকে সমুদ্রের জলকল্লোল, মাঝে সন্দ্বীপ,' সেই দ্বীপরাজের অধীশ্বর তাম্বুল, তার কন্যা মধুমালা। আরাকানের মগ রাজা চিত্র সেন তার পুত্র কুব্জপৃষ্ঠ বিচিত্রকুমার। ত্রিপুরার রাজা ইন্দ্রজিত, তার কন্যা কাঞ্চনমালা। মদনকুমার মধুমালার সন্ধানে এসে দৈবদুর্বিপাকে পরিণয়ের 'অভিনয়' করল কাঞ্চনমালার সঙ্গে। শুভদৃষ্টির পর নবপরিণীতাকে মদনকুমার বলছে,

'আমি মধুমালার সন্ধানে বেড়িয়েছিলাম সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে। পথে জাহাজ ডুবি হয়ে আমার সেনা-সামন্ত সকলে মারা যায়। আমার যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম আমি মগ-রাজের রাজপুরীতে বন্দি। মগ-রাজপুত্র অতি কুৎসিত বলে রাজা আমাকে দেখিয়ে তোমার সাথে তাঁর সম্বন্ধ ঠিক করেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই শর্তে যে, বাসর ঘরে ঢুকেই আমি বেরিয়ে পড়ব– তিনি তাঁর সেনা দিয়ে আমাকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এখন তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক করে নিও। ...'

কাঞ্চনমালা কিন্তু বেছে নিল যোগিনীর অভিসার পথ; স্বামী-সন্ধানে একদিন পৌঁছিল গিয়ে সাগরঘেরা দ্বীপেরকূলে। মধুমালা ঘুমপরীর মুখে শুনেছিল কাঞ্চনমালার সাথে মদনকুমারের 'অপরূপ বিবাহের কথা'; তাই তাদের অমৃত 'সংসারকে লবণাক্ত করতে' চাইল না; কাঞ্চনমালার হাতে মদনকুমারকে সমর্পণ করে সমুদ্রের জলে করল আত্মবিসর্জন। আত্মত্যাগের ক্ষণে চির আরাধ্যকে উদ্দেশ করে আর্তকণ্ঠে বলল, 'হে আমার চির জনমের স্বামী– প্রণাম। প্রণাম।'

এই উপসংহার অতি করুণ। ক্লাসিক্যাল আদর্শের নাট্যকারেরা এরূপ বিষাদান্ত ঘটনাকে করে থাকেন দৈব-নিয়ন্ত্রিত। এখানে মধুমালা যদি 'সাগর জলে ঝম্প প্রদান' না করে দৈবক্রমে সৈকতচ্যুত বা তরঙ্গতাড়িত হয়ে আত্মদান করত, তাহলে ঘটনাটি সমগ্র নাটকের সঙ্গে সুসংগত হতো। নাটকের কোনো ঘটনা যাতে অকস্মাৎ অতিমাত্রায় আঘাত না করে, সেজন্য 'অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা আবৃত' করে তার নাট্যসৌন্দর্য সুষম রাখা ক্লাসিকপন্থি নাট্যকারের রীতি। মধুমালা গীতিনাট্যে এই রীতির সার্থকতা প্রতিপন্ন করছে ঘুমপরী ও স্বপ্নপরীর ভূমিকা।

কাজী নজরুল ইসলামের নাটক বা গীতিনাট্যের ভাষা মধুবর্ষী, নিপুণ গাঁথুনিতে সুঠাম শব্দগুলো হীরকখণ্ডের মতো ঝকমক করছে। দক্ষ শিল্পীর মতো নজরুল চরিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন; তাতে ভাস্কর্যের দীপ্তি আছে, তারও চেয়ে বেশি আছে প্রাণের স্পর্শ। তাঁর প্রতিটি নাটক, গীতিনাট্যের শিল্পসৃষ্টি মহান ও কালজয়ী।

আতিক আজিজ: লেখক, সংগঠক, সাংবাদিক ও গবেষক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গ্রন্থাগার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা যৌথভাবে ১৪ই মে এই লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভাপতি ও শেখ রেহানা সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

সেসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের গ্রন্থাগার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে নতুন প্রজন্মকে সহায়তা করবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫-এর পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে জাতির পিতার খুনিদের বিচার বন্ধ করে দেয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র, শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে পদক্ষেপসমূহ

জিনাত আরা আহমেদ

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো তথ্যের অধিকার নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকার সুরক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দাপ্তরিক নানা কাজে নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় যেতে হয়। নির্ধারিত অফিসে সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন সম্পন্ন করতে হয়। এরপর কাজের ধরন অনুযায়ী আইনানুগ পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দাপ্তরিক কার্যক্রম সমাধানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব নাগরিকের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণীয়। কিন্তু সহজ সমাধান সবক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, ভোগান্তির শিকার হন অনেকেই। এর জন্য সঠিক উপায় হলো তথ্য জানা।

সঠিক তথ্য জানলে মানুষ সেই অনুযায়ী আবেদন করতে পারবে। তথ্য জানা থাকলে কোনো দপ্তরে সেবা পেতে কত টাকা জমা দিতে হবে– তা জানবে। কত দিনের মধ্যে চাহিত তথ্য পাওয়া যাবে তা জানলে, তিনি কারণ জানতে চাইবেন। আরও বিশদ জানতে চাইলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জেনে নেবেন। কিন্তু তথ্য না জানায় সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই হয়রানির শিকার হন। নাগরিকেরা প্রায়শ কিছু বিশেষ কারণে দাপ্তরিক কার্যক্রম সমাধানে প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েন। প্রথমত সাধারণ মানুষের অনেকেই বিধিবিধান সম্পর্কে সচেতন নন। এই সুযোগ নিয়ে কিছু সুবিধাবাদী লোক মানুষকে জিম্মি করে ফায়দা নিতে চায়। যেমন- টাকাপয়সার বিনিময়ে কাজ করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কখনোবা দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা আদায় করে। সবক্ষেত্রেই লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষের প্রয়োজন যেখানে বেশি জরুরি সেখানেই কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে। তাই নাগরিক স্বার্থ সুরক্ষায় সরকার কিছু আইন ও বিধি জারি করেছে, যার সাহায্যে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে নাগরিক তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারবেন।

নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে যে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে, তা হলো 'তথ্য অধিকার আইন'। দুর্নীতি রোধে নাগরিকের সরাসরি হস্তক্ষেপ তথা জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের অঙ্গীকারে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্যই হলো জনগণের ক্ষমতায়ন। এটি তথ্য আদায়ে নাগরিক অধিকার অর্জনের হাতিয়ার। যে-কোনো সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত কিংবা আইনানুযায়ী সৃষ্ট সংস্থায় জনগণ তার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য আবেদন করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য দেওয়া আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেলে, আদৌ তথ্য না পেলে কিংবা অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন নির্ধারিত সংস্থার পরবর্তী উর্ধ্বতন অফিসের প্রশাসনিকপ্রধান। তথ্য না পেয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে তার সমাধান দিবেন। আপিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জনবান্ধব করে তুলতে বর্তমান সরকারের নীতি ও কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন সময়ে নানা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানকে সেবামূলক করতে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা ও কর্মনিষ্ঠা প্রধান ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি মানুষের নীতি, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবল সরকারি বিধিবিধানের প্রতি আন্তরিক থাকার পাশাপাশি দায়িত্ব পালনে কর্তব্যনিষ্ঠ করে তোলে। তাই এ বিষয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। নিয়মিত সভা করে প্রতিটি অফিসে কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে কর্মচারীদের সততার মূল্যায়নেও রয়েছে বিশেষ প্রণোদনা।

সরকারি অফিসের সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জনগণের কাছে সহজবোধ্য করার একটি নির্ভরযোগ্য উপায় 'সিটিজেন চার্টার'। প্রত্যেক দপ্তরে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজের ধরন ও সেবাপ্রাপ্তির খুঁটিনাটি বিষয়ে জনগণ সরাসরি জানতে পারে। এতে নির্দিষ্ট অফিসের সেবা কার্যক্রম এবং পদ্ধতিগত বিষয় দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করার মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে।

নাগরিক সেবায় জনগণের আস্থা অর্জনে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' নামে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছে প্রতিটি সরকারি অফিসে। এর মাধ্যমে দাপ্তরিক সেবার মান কিংবা পণ্য সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে। শুধু নাগরিক নয় বরং অন্য কোনো দপ্তর অথবা উক্ত অফিসে কর্মরত কিংবা পেনশনভোগী কর্মচারীও তার অভিযোগ জানাতে পারবেন নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনের মাধ্যমে। নিয়ম অনুযায়ী দপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) অভিযোগ তদন্তে ব্যবস্থা নিবেন। এক্ষেত্রেও আপিলের সুযোগ রয়েছে। আপিল কর্মকর্তা হবেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরবর্তী উর্ধ্বতন দপ্তরের অনিক। মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আপিল কর্মকর্তা হবেন একজন অতিরিক্ত সচিব অথবা অনিকের জ্যেষ্ঠ যুগ্মসচিব।

জনগণের সঙ্গে সরকারি অফিসের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে প্রতিটি অফিসে গণশুনানির জন্য সপ্তাহে একদিন ধার্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো সরকারি অফিসে তার প্রয়োজনের বিষয় অফিসপ্রধানের কাছে জানাতে পারবেন। তাছাড়া বিষয়টি যদি অন্য অফিস সংশ্লিষ্টও হয় তথাপি ঐ কর্মকর্তা নির্দিষ্ট অফিসে তার বিষয়টিতে সুপারিশ করতে পারবেন।

এখন সব অফিসে চালু হয়েছে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে নিয়মিত সভা। এর উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রার্থীদের মতামত গ্রহণ করে সেবা সহজিকরণ এবং দ্রুততার সঙ্গে মানসম্মত সেবা দিতে কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা। স্টেকহোল্ডরদের সঙ্গে পারস্পরিক মতবিনিময়ের ফলে কর্মচারীগণ সেবা প্রদানে নৈতিকভাবে এক প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হন, যা সরকারি অফিসের ভাবমূর্তি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারি দপ্তরসমূহে অসংখ্য কর্মসূচি চলমান রয়েছে। সরকারি সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের কথা জনে জনে পৌঁছে যাবে।

জিনাত আরা আহমেদ: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, খুলনা, jinat20info@gmail.com

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা'র আওতায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। পেছনে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়

ঘুরে এলাম দুটি পাতার একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট

সেলিনা আকতার

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে এপিএ নির্দেশিকা ২০২১-২০২২-এ বর্ণিত 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা'র আওতায় ১৩ই মে থেকে ১৫ই মে ২০২২ পর্যন্ত দুটি পাতার একটি কুঁড়ির দেশ সিলেট ভ্রমণ করি। আমরা ছিলাম ১০ জন। যাবার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই চলছিল প্রস্তুতি। তিন দিনের প্রশিক্ষণের জন্য আমরা সিলেটের তিনটি স্থান বেছে নিয়েছিলাম। সময় যাতে নষ্ট না হয় এজন্য ১২ই মে অফিস শেষে ঢাকা থেকে সিলেটের পথে যাত্রা শুরু করি। রাত ১১টা নাগাদ সিলেট পৌঁছে যাই। শহরে ঢোকার পূর্বেই পানসী হোটেল থেকে রাতের খাবার খেয়ে গেস্ট হাউজে এসে পৌঁছালাম।

১৩ই মে সকাল ১০টার মধ্যেই নাস্তা সেরে রওনা দিলাম ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরে। রাস্তার দুপাশের সবুজ প্রকৃতি ও হাওর দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ভোলাগঞ্জে। এরইমধ্যে আকাশ কালো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আমরা বিজিবি ঘাটে গিয়ে নৌকা ভাড়া করার ফাঁকে ফাঁকে মেঘালয় সীমান্ত দেখছিলাম। মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম বাংলাদেশের জন্যে কেন এ অঞ্চলটা থাকল না। নৌকায় বসে দেখছিলাম চারপাশের ভারতের মেঘালয় রাজ্যের উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো থেকে নেমে আসা ঝরনার পানি। এই পানির ঢলের সাথে সাথে চলে আসে পাথর। দেখতে দেখতে চলে এলাম ভারতীয় সীমান্তের বড়ো বড়ো সাদা পাথরের কাছে। যতদূর চোখ যায় কেবল সাদা সাদা পাথরের মাঝে স্বচ্ছ নীল জল। উপরে নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড়ের আলিঙ্গন। প্রকৃতি যেন এক অপরূপ সাজে সেজে আছে। সবাই যে যার মতো বড়ো বড়ো পাথরে বসে উপভোগ করছিলাম প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য, কেউবা কিছুটা পানিতে নেমে গিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ও যোগ দিয়েছিলেন। সবাই ফটোসেশনে ব্যস্ত কিন্তু এ আনন্দে বাধ সাধল বিজিবির সদস্যদের বাঁশির হুইসেল। সবাইকে হুঁশিয়ার করে পানি থেকে সরে আসার জন্য। কারণ আবহাওয়ার বিপদ সংকেত। এরই মাঝে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি শুরু হলো। প্রায় ৩০ মিনিট চলল বৃষ্টিপাত। বৃষ্টির পানি ও পাহাড়ি পানির ঢলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে ফেললাম সাদা পাথরগুলো। বিজিবির ক্যাম্প ছাড়া ওখানে কোনো বিশ্রামাগার ছিল না। সবাই ভিজে একাকার। দর্শনার্থীদের মধ্যে কয়েকজন শিশুও ছিল। ওদের এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় বিজিবির রুমটা খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে নারী ও শিশুদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিলল।

মেঘালয়ের পাহাড়গুলোর এই মোহনীয় রূপ বৃষ্টি হয়েছে বলেই দেখতে পেলাম। এরপর বৃষ্টি থেমে গেলে আমরা ফিরে আসার জন্য নির্ধারিত নৌকায় উঠলাম। আবারও মুগ্ধ চোখে অবলোকন করলাম প্রকৃতির এক অনন্য রূপ। নদী, পাহাড় আর মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতেই চলে এলাম ঘাটে। নৌকা থেকে নামতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তারপরেও নামতে হলো। ঘাটে ফ্রেশ হবার এবং খাবারের ব্যবস্থা আছে, তবে পর্যাপ্ত নয়। এখানে আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে বিদেশি পর্যটকদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। এদিকে নজরদারি বাড়াতে হবে।

মেঘ আর পাহাড়ের সুখময় স্মৃতি নিয়ে সিলেট শহরে ফিরে এলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। ক্ষুধা নিয়েই শহরের পাঁচভাই হোটেলে ঢুকলাম খাবার

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এপিএ নির্দেশিকা ২০২১-২০২২-এর 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষণ' কর্মশালা

খেতে। এই হোটেলের অনেক গল্প শুনেছিলাম। এসে মনে হলো গল্পগুলো সত্যি। এই হোটেলের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরা খুব সুশৃঙ্খলভাবে খাবার পরিবেশন করেছে। এ হোটেলে সব ধরনের খাবারই আছে। নদীর মাছ, গরু, হাঁস, মুরগি, কবুতর, বকের মাংসসহ হরেক রকমের ভর্তা, চাটনি, সবজি। তারা সবার অর্ডার নিচ্ছে হাসিমুখে বিরক্ত না হয়ে। সঠিকভাবে সব টেবিলে খাবার পরিবেশনও করছিল। এখানে এসে মনে হলো বাঙালি চাইলে অনেক কিছুই পারে। যাক, ভুরিভোজ সেরে আমরা গেস্ট হাউজ ফিরলাম। রাতে লামা বাজার মনিপুরী মার্কেট গেলাম আমাদের ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী শাড়ি ও সেলোয়ার কামিজ কেনার ও দেখার জন্য। এখন আগের মতো তাঁতবস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না। দোকানিদের কাছ থেকে জানতে পারলাম মনিপুরীরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরি করছে, তাঁত বুনছে না। অনেকে পিতৃপুরুষের পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করছে। এই ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের এই শিল্পের জন্য আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরদিন ১৪ই মে সকালে পানসী হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে রওনা দিলাম প্রকৃতিকন্যা জাফলংয়ের উদ্দেশে। অঝোর ধারার ভারি বর্ষণের মধ্যে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। রাস্তার দুপাশের প্রকৃতি দেখতে দেখতেই সারি নদী পার হলাম। আমরা যখন তামাবিল জিরো পয়েন্ট পার হচ্ছি তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। এরইমধ্যে রাস্তার ডানপাশে মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পারছিলাম। কিছুদূর পার হতেই আমরা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি দেখার জন্য। মনে হলো হাত বাড়ালেই মেঘ ছুঁয়ে দিতে পারব। প্রকৃতির এই মায়াময় দৃশ্য উপভোগ করা যায় কিন্তু বোঝানো যায় না। এখানেও চলল ফটোসেশন। আবার কখন বৃষ্টি নেমে পড়বে এ শঙ্কা থেকে আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসলাম। পিয়াইন নদীর দুপাশের রাস্তা পাথর দিয়ে মুড়ে সুন্দর করে করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসলাম ১নং ঘাটে। এখান থেকে একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে দুটো নৌকায় চড়ে বসলাম। পুরো পিয়াইন নদী ঘুরে ওপারে ঝরনা, খাসিয়া পুঞ্জি ও ডাউকি বন্দরের ঝুলন্ত ব্রিজ দেখলাম। পানি বেশি থাকার কারণে দূর থেকে ঝুলন্ত ব্রিজ দেখে চলে এলাম সংগ্রাম পুঞ্জির মায়াবী ঝরনায়। এটা ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত তারপরও বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত। বৃষ্টি, পাহাড়, নদীর স্বচ্ছধারা এক অপার্থিব মায়াবী সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে বলেই এ ঝরনা মায়াবী ঝরনা নামে পরিচিত। ডাউকির উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা এই ঝরনা যতই দেখছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম প্রকৃতির এ দান দেখে। অনেকখানি দূরে নৌকা থেকে নেমে হেঁটে আসতে হয় এ ঝরনায়। আসার সময় দূর থেকে ঝরনার পানির শব্দ পাচ্ছিলাম। কাছে গিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। নেমে পড়লাম স্বচ্ছ স্ফটিক পানির ধারার মধ্যে অনেক উঁচু-নিচু পাথর ভেদ করে। আমাদের পুরুষ সহকর্মীরা চড়ে বসল ঝরনার উঁচু সীমানায়। ভয় হচ্ছিল একটা পাথর কোনোভাবে সরে পড়লে রক্ষা থাকবে না। প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান উপর থেকে তাদের ছবি তুলল। আমরা ছবি তোলায় অংশ নিলাম। এভাবে কখন যে সময় চলে যাচ্ছিল যদি গাইড এসে তাড়া না দিত তাহলে ওখানেই আমাদের সময় গড়িয়ে যেত। আমাদের তো আবার খাসিয়া পুঞ্জিতে যেতে হবে। আসার পথে দেখলাম রাস্তার দুপাশে প্লাস্টিকের শামিয়ানা টেনে দোকানিরা ভারতের বিভিন্ন প্রসাধনী ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বসে আছে। সামান্য কিছু কেনাকাটা করে মায়াবী ঝরনাকে বিদায় জানিয়ে খাসিয়া রাজবাড়ি দেখার জন্য রওনা হলাম।

জাফলংয়ের মায়াবী ঝরনা

এবার নৌকা থেকে নেমে অনেক উঁচু-নিচু পাথর মারিয়ে আমরা সমতল এলাকায় উঠে আসলাম। পূর্বেই ঠিক করে রাখা তিনটি অটোতে গাইডসহ রওনা দিলাম খাসিয়া পুঞ্জির দিকে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি গজারি, সুপারিগাছ, লতানো পান গাছ। মনে হচ্ছিল গভীর সবুজ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। অনেকখানি যাবার পর কিছু ঘরবাড়ি দেখতে পেলাম। কিছু উঁচু পিলারের উপর পাকা বাড়ি। বাড়িগুলোর নির্মাণশৈলী অনেক সুন্দর। চারপাশে ব্যালকনি দেওয়া এবং ফুলের বাগান রয়েছে। এদের পুরো এলাকা বেশ পরিচ্ছন্ন। কিছুদূর পর পর রাস্তার পাশে পুঞ্জিগুলোর নাম দেখলাম। নামগুলো ছিল বল্লা, সংগ্রাম পুঞ্জি, নকশি পুঞ্জি, লামা পুঞ্জি, প্রতাপপুর পুঞ্জিসহ পাঁচটি পুঞ্জি। আমাদের অটোচালক ছিলেন স্থানীয় ।

রাতারগুলের মিঠাপানির জলাবন

তার কাছ থেকে জানা গেল রাজপরিবারের কেউ এখানে থাকেন না। ভারতে থাকেন কিন্তু এখানকার লোকজন তাকেই খাজনা দেয়। তার নির্দেশেই প্রশাসন চলে। এখানে বাহির থেকে আগত কোনো লোক সন্ধ্যার পর অবস্থান করতে পারে না। নকশি পুঞ্জিতে ছিল খাসিয়ার রাজবাড়ি। বিশাল বিশাল তিনটি বাড়ি। একেবারে চকচকে নতুন বাড়িগুলোতে ঢুকে দেখলাম তেমন লোকজন নেই। ধর্মগুরু জাতীয় দু-একজনকে দেখা গেল কিন্তু কথা বলতে রাজি হলো না।

একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দেখতে পেলাম সমতল ভূমির চা বাগান। সবুজ আর সবুজ। বিস্তৃত এলাকায় চা বাগান। এ বাগান স্থানীয় খাসিয়ারা দেখভাল করে। চা তুলে বিক্রি করে এবং সেই টাকা খাসিয়া রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা কোন্দল নেই। শান্ত-সুনিবিড় পরিবেশের অনুভূতি সাথে নিয়ে ফিরে এলাম সিলেটে। রাতে হযরত শাহজালাল (র.) মাজার দর্শন শেষে ঐ এলাকায় রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। গেস্ট হাউজের পাশেই ক্বীন ব্রিজ, সুরমা নদীর তীর ও আমজাদের ঘড়ির গোলচত্বর। মাঝরাত অব্দি ওখানে চলল আড্ডা। রাতের নিস্তব্ধতাকে ঘিরে নদীর আছড়ে পড়া উত্তাল ঢেউয়ে আমাদের মনটা এমন এক আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে বুঝতেই পারিনি রাত যে এত গভীর হয়ে গেছে। যাক তাড়াতাড়ি রুমে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম ।

১৫ই মে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে নাস্তা সেরে বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির জলাবন বা সোয়াম্প ফরেস্ট এবং বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য রাতারগুলে এলাম। রাতারগুলের নৌকা ভ্রমণের জন্য তিনটি ঘাট আছে। আমরা ১নং ঘাটে এসে নৌকা ঠিক করে উঠে পরলাম তিনটি নৌকায়। যেতে যেতে চোখে পড়ল হিজল, করচ আর বরুন গাছ। দূর থেকে জলে নিম্নাঙ্গ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলো দেখতে অপূর্ব লাগছিল। মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম পানি-গাছগাছালির মিলনে সৃষ্ট সবুজ সমারোহ। বাংলার আমাজন নামে পরিচিতি এ জলাবনে শুনছিলাম সাপের আবাস বেশি। তবে আমাদের চোখে জোঁক, চ্যালা ও বড়ো বড়ো লাল-কালো পিঁপড়া চোখে পড়ল বেশি। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বিশাল আকারের শকুন। যেভাবে ডানা মেলে উড়ছিল মনে হলো ওর ঝাঁপটায় আমাদের নৌকা ডুবে যাবে। বিস্মিত চোখে দেখছিলাম সাদা বক আর পানকৌড়ির মাছ ধরার অসাধারণ কৌশল। মেঘ আর রোদের লুকোচুরির মাঝেই আমরা ডিঙ্গি নৌকায় রাতারগুল ঘুরলাম। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

সবুজ-শ্যামল সিলেটের অপার সৌন্দর্যের স্মৃতি নিয়ে দুপুরবেলা ঢাকায় ফিরে আসার জন্য রওনা হলাম। পথে আসতে আসতে হবিগঞ্জের আনারসের স্বাদ নিতে ভুল করলাম না। দশ টাকা পিস ছোটো আনারসগুলো দারুণ রসালো ও মিষ্টি। শেষ বিকেলের সূর্য দিগন্ত ছুঁয়েছে। মায়াবী এ স্নিগ্ধ সময়ে মনে হলো আরও কিছুদিন থাকা গেলে ভালো হতো।

সেলিনা আকতার: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

আলোকিত মানুষের প্রাণ

হাসান হাফিজুর রহমান

ম. মীজানুর রহমান

পঞ্চাশ দশকে বাংলাদেশের তমসাকীর্ণ সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তরুণ কবি হাসান হাফিজুর রহমানের আবির্ভাব এবং দুরন্ত অভিযাত্রা স্মরণযোগ্য। তাঁর জন্ম জামালপুর জেলার ইসলামপুরে ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন। কিন্তু কলকাতার বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন 'হাসানের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়' প্রবন্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি সাহিত্যিকের প্রথম রচনা প্রকাশ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। হাসান হাফিজুর রহমানেরও অল্প বয়সের লেখা 'অশ্রুভেজা পথ চলতে' শীর্ষক একটি গল্প ১৩৫৪ সালের (ইংরেজি ১৯৪৭) বৈশাখ সংখ্যা *সওগাত*-এ ছাপা হয়। তখন কলকাতা থেকে *সওগাত* বের হতো এবং এটাই *সওগাত*-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম লেখা। গল্পটিতে পল্লিগ্রামের সাধারণ ঘটনা নিয়ে লেখা কিন্তু এর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল এবং গল্পাংশ ছিল মর্মস্পর্শী। গল্পের কথোপকথনে গ্রামীণ ভাষা প্রয়োগ করায় গল্প স্বাভাবিক হয়েছিল। এর পরে *সওগাত*-এ তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৩৫৬ সালের কার্তিক সংখ্যায়।

সেসময় বাংলা ভাষা নিয়ে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এ আন্দোলনে অগ্রগামী ছিলেন। সেসময়ে এখানে কোনো সক্রিয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভাষা সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও উর্দু বিরোধিতাই পূর্ণ উদ্যমে চলছিল। ছাত্ররা মিছিলের পর মিছিল বের করে রাষ্ট্রভাষার দাবি উত্থাপন করেছিল।

এমনি দুর্দিনে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে হাসান হাফিজুর রহমান কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিককে নিয়ে ৬৬নং লয়াল স্ট্রিটস্থ *সওগাত* কার্যালয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রথম তাঁকে দেখলাম। বয়েস বেশি না হলেও আলাপ-আলোচনা করলেন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো। তিনি বললেন, ঢাকায় আমাদের কোনো সাহিত্য পরিষদ বা সংসদ নেই। তাই আমরা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাজ শুরু করেছি। এ ব্যাপারে এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের অফিস বা সভা করবার স্থান নেই। আমরা শুনেছি, আপনি কলকাতায় কবি-সাহিত্যিকদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে কবি-সাহিত্যিকদের সমবেত হবার ও তাদের সাহিত্যালোচনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঢাকায় আমাদের জন্য যদি অনুরূপ ব্যবস্থা করে দেন, তবে এখানকার লেখকগোষ্ঠী আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।...

সওগাত কার্যালয় সংলগ্ন প্রশস্ত ঘর ও সম্মুখে খোলা জায়গা ছিল। স্থির হলো, ওখানেই তাঁদের সংসদের সদস্যরা এবং অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকরা সমবেত হবেন এবং আলোচনাসভা ইত্যাদি করবেন। অতি উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক দল বিলম্ব না করেই এখানে তাদের নব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'।

ইতঃপূর্বে *সওগাত* পত্রিকা ছিল বন্ধ। হাসান হাফিজুর রহমানের ও তাঁর কবি-সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের সহায়তায় *সওগাত* নতুন আলোর মুখ দেখল। হাসানের সততা ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন *সওগাত* সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেব। তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। আজ যাঁরা বাংলাদেশের কাব্য ও সাহিত্যজগতে খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের বেশির ভাগ সদস্যই এই *সওগাত* পত্রিকার সান্নিধ্যে এসে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের মহাসুযোগ লাভ করেছেন। হাসান হাফিজের ভাষায় "... নাসিরউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা *সওগাত*-এর প্ল্যাটফর্মে একত্র হয়েছিলাম, এটাই বড় কথা। ... আমরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গড়ে তুললাম সেই ১৯৫২ সালেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রথম সংগঠন নাসিরউদ্দীন সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হলো। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব সভাপতি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, বেগম সুফিয়া কামাল, অজিত কুমার গুহ, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আনিস চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, খালেদ চৌধুরী, লাইলা সামাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। সেই সময়ে সাহিত্যসভার প্রতিটিতেই প্রায় দুশো-আড়াইশো লোক জমায়েত হতেন। অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকও উৎসাহের সঙ্গে এই সভায় যোগ দিতেন। তরুণদের নতুন চেতনার সঙ্গে তাঁদের পরিণত মনোভাবের গভীর যোগাযোগ ঘটতো তা অগ্রসর চিন্তার অনুকূল, তারই একটি স্থায়ী আসন। পাকাপোক্তভাবে দ্রুত গড়ে উঠতে লাগলো। প্রতিক্রিয়ার কাছে এদেশের সাহিত্য যে আত্মসমর্পণ করেনি বা পরাজিত হয়নি, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ভূমিকাই তার জন্য সর্বত কৃতিত্বের দাবীদার, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। ..."

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে বাহান্নর উত্তপ্ত আবহে হাসান যেমন সমাজ সচেতনতায় ও স্বদেশপ্রেমে আত্মনিবেদিত প্রাণ, তেমনি প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মে ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠা, অকাতরে শ্রমদান, ত্যাগ তাঁর জীবন-চারিত্র্যে অমূল্য উজ্জ্বল অলংকারে করেছিল বিভূষিত। এসব গুণাবলি ছাড়া একজন সৎ সাহিত্যিকের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তিনি একাধারে সাহিত্য সংগঠক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, কবি, সাংবাদিক, অধ্যাপক, সমালোচক, বিশ্লেষক ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। 'অন্তরঙ্গ কথামালা'য় তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ সুলতান লিখেছেন– 'তিনি একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ও। লেখালেখিতে জড়িয়ে না পড়লে পরবর্তীকালে হাসান প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় হতে পারত। তার সাহিত্যিক বন্ধুরা তা হতে দেয়নি। সকালে-দুপুরে বা সন্ধ্যায় অনেকদিন হাসানকে পাওয়া যেত না–অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিলতো কোনো প্রেসে বসে আছে। কোনো পত্রিকার সম্পাদনায় সে ব্যস্ত। যে-কোনো ইশতাহার বা ক্ষুদ্র আকারের পত্রিকার নিয়মিত সম্পাদক সেই থাকতো।' দেশের খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক এবং জাতীয়

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তাঁর এক নিবন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন, 'ষাটের দশকে হাসানের তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় : *বিমুখ প্রান্তর*, *অন্তিম শরের মত*, *আর্ত শব্দাবলী* । এর বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকে, বাহান্ন পরবর্তীকালে। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ তার কাব্যে একই সাথে ধারণ করেছে দহনজ্বালা, রক্তাক্ত ক্ষোভ, স্নেহসিক্ত মাধুর্য, প্রাণবন্ত আশা। অমর একুশে, চিরাচরিত ছবি, স্বদেশে পরিব্রাজকসহ বহু কবিতায় এর নিদর্শন স্পষ্ট। সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয়েছে হাসানের কাব্যগ্রন্থ *যখন উদ্যত সংগীন* ও *বজ্র চেরা আঁধার আমার*। সেখানেও তাঁর কাব্যের বলিষ্ঠতা, জীবনঘনিষ্ঠ ঋতু চিত্রকল্প এবং দৃপ্ত সাহসী উচ্চারণ সমকালীন অনেক কবি থেকে আলাদা করে তাকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। 'জীবনের হাতে ছুরি' কবিতায় সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে সকল বেদনা বঞ্চনা অপমৃত্যুর কালোর ফাঁকে ফাঁকে অগ্নিমুখী জীবনের দ্যুতি ঝলসে ওঠে'।

নির্ভীক আলোকিত প্রাণ কবি হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্ক হয়ে জ্যোতিষ্মান রইবেন-এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর ছিল দারুণ প্রত্যয়। আধুনিক কবি এবং তার কবিতা কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তাঁর একটা নিজস্ব ধারণা ছিল।

কাব্যগ্রন্থসমূহ: *বিমুখ প্রান্তর* (১৯৬৩), *আর্ত শব্দাবলী* (১৯৬৮), *অন্তিম শরের মত* (১৯৬৮), *যখন উদ্যত সংগীন* (১৯৭২), *বজ্রচেরা আঁধার আমার* (১৯৭৬), *শোকার্ত তরবারি* (১৯৮২), *আমার ভেতরের বাঘ* (১৯৮৩) এবং *ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী* (১৯৮৩)।

সমালোচনা গ্রন্থসমূহ: *আধুনিক কবি ও কবিতা* (১৯৬৫), *সাহিত্য প্রসঙ্গ* (১৯৭০), *মূল্যবোধের জন্য* (১৯৭০), *দক্ষিণের জানালা* (১৯৭৫), *আলোকিত গহ্বর* (১৯৭৭)।

সম্পাদনা: *দাঙ্গার পাঁচটি গল্প* (১৯৫০), *২১শে ফেব্রুয়ারি* (১৯৫৩), *সমকাল* পত্রিকা, *পরিক্রম* পত্রিকা।

ছোটো গল্প: *আরো দুটি মৃত্যু* (বিশ্ব ছোটো গল্পের অন্তর্ভুক্ত)। তাঁর অনেক রচনা ইংরেজি, উর্দু ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সাহিত্য বিষয়ক অবদানের জন্য পুরস্কারসমূহ: লেখক সংঘ পুরস্কার (১৯৬৭), আদমজী পুরস্কার (কবিতা, ১৯৬৮), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (কবিতা, ১৯৭১), সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২)। এছাড়া বিশ্বের বহু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেছেন এবং সম্মানিত হয়েছেন। আজ এই মহান কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তথা আলোকিত প্রাণের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত ও গর্বিত বাংলাদেশ।

আধুনিক কবি ও কবিতা কাব্য সমালোচনা গ্রন্থ যেটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশ হওয়ার এক দশক পরে আরও একটা সংস্করণ হয়েছিল তার লোকপ্রিয়তার কারণে। এর পরের গ্রন্থ *সাহিত্য-প্রসংগ* (১৯৭০) একইভাবে দুবার প্রকাশ পায় অল্প সময়ের মধ্যে। তাঁর সাংবাদিকতার স্বাক্ষর কলাম তথা সাহিত্য সমালোচনা সমাহার *দক্ষিণের জানালা* (১৯৭৫)। তবু কবির মনেও একদা হতাশার মধ্যে প্রত্যয়ী আশা দানা বেঁধেছিল:

'মতিচ্ছন্ন বার্ধক্য জেঁকে আসছে অবধারিত / পেছনের সমস্ত দাগ মুছে ফেলে? / তোমাদের কেমন করে বলবো সব বার্ধক্য এমন হয় না। / এ কি আমারও পরিণাম? / এমনও বার্ধক্য আছে, তরুণের উচ্চারকিত উদ্বোধনী গানের মতোই / তা নিঃসংশয়– জীবনের শুরুর মতোই তা শেষ হয় / প্রাণের শীর্ষ আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে চারপাশের অন্তহীন / সুখে ছড়িয়ে। / সে স্বপ্ন আমি কিছুতেই চোখ থেকে মুছে / ফেলতে পারি না। / মনে হয় আর দু পা এগুলেই আমার কোনো পা ফেলাই / আর মুছে যাবে না। / আমি সেই অমৃত সময়কে / খুঁজে ফিরছি।'

কবিতার শব্দ চয়নে এবং অন্যান্য প্রকরণ মেশাতে এ কবি যে পারঙ্গম ছিলেন তার অনবদ্য গদ্য চিত্রায়িত হয়েছে প্রায় প্রতিটি কবিতায় আর এটাই ছিল তাঁর সচেতনতা। তাঁর সব লেখাতে তিনি যেন তাঁর আলোকিত প্রাণ মেলাচ্ছেন। এই আলোকিত প্রাণের কবি ১৯৮৩ সালের পহেলা এপ্রিল মস্কোর সেন্ট্রাল ক্লিনিকাল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

ম. মীজানুর রহমান: কবি, অনুবাদক, নজরুল গবেষক, পুস্তক সমীক্ষক ও কলামিস্ট

৬৪টি জেলা ও ৪০৬টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স

দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪০৬টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪টি জেলা ও প্রায় ৯৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০৬টি উপজেলায় এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। আরও ৩৩টি উপজেলায় নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। মোট ৪৭০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ১৬৪টি স্মৃতিসৌধ ও ২৩টি জাদুঘরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮৬টি স্মৃতিসৌধ ও ৪১টি জাদুঘর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ৩রা এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। সভায় জানানো হয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বরাদ্দকৃত মোট ৩৪১.৫৯ কোটি টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ১৬৫.৮৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৪৮.৫৫ শতাংশ।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ও চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়), উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধকালে শহিদ মিত্রবাহিনী সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ প্রকল্প, ডেভেলপমেন্ট অব প্রজেক্ট প্রপোজাল ফর এস্টাবলিশমেন্ট অব প্যানোরমা ইন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া আরও ৪টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও সভায় জানানো হয়।

প্রতিবেদন: মৌসুমি আক্তার

১৯শে মার্চ ১৯৭২ ঢাকার বঙ্গভবনে ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর শেষে করমর্দন করছেন দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরমবন্ধু ইন্দিরা গান্ধী

পাপিয়া সুলতানা পান্না

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক পরিক্রমা। রয়েছে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অসামান্য, অকৃত্রিম, অভূতপূর্ব অবদান। এসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরই একজন হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনবদ্য আত্মত্যাগী বন্ধু বললেও অত্যুক্তি হবে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ভারতের বিখ্যাত নেহেরু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ ও কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরুর নাতনি, বিখ্যাত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও কমলা দেবীর কন্যা তিনি। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। শৈশবে তিনি সুইজারল্যান্ড এবং পরে অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেন। ১৯৩৪-১৯৩৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং সেসময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাম দিয়েছিলেন প্রিয়দর্শিনী গান্ধী।

ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতিতে আগমন করেন পারিবারিক সূত্রে। তিনি ১৯৪২ সালের পর পর ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। স্বামী ফিরোজ গান্ধীর সাহচর্যে তাঁর রাজনীতির মাঠে বিচরণ আরও গতি পায়। রাজনীতির কারণে তিনি কারাগারেও গিয়েছিলেন এবং এরপরই তিনি দ্বিগুণ উদ্যম নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। শুধু ভারত উপমহাদেশেরই নন, তিনি ছিলেন সারা বিশ্বে অগ্রগণ্য একজন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকদের ভাষায় তিনি হলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে নারী নেতৃবৃন্দগণ মত ব্যক্ত করেন যে, 'নারী রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি ভিন্নমাত্রার জন্ম দেয়। নারীর সহজাত সতর্কতা এবং ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরা এবং তার সমাধানকল্প ব্যক্ত করার প্রবণতা থাকে তাদের মধ্যে।'

এ বক্তব্যের পূর্ণ বাস্তবতা আমরা ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনে পাই। নিজ ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতাবলে তিনি ১৯৬৪ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭, ১৯৮০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৫ বছর অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯৫২ সাল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের যে পথ চলা, সে চলার পথে ষাটের দশক থেকে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন তাঁর অন্যতম মিত্র। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে ঢাকায় পাকিস্তানি হায়েনাদের দ্বারা যে গণহত্যা চালানো হয়, ২৭শে মার্চ ইন্দিরা গান্ধী ভারতের লোকসভায় তাঁর ভাষণে এর বিবরণ ও করণীয় তুলে ধরেন। ৩১শে মার্চ লোকসভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর পর ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সংকট আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাণী পড়ে শোনান। বাণীতে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থনের কথা বিবৃত হয়, যা প্রায় ৮০টি দেশের প্রতিনিধি সাদরে গ্রহণ করেন। ৮ই আগস্ট বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের কাছে তিনি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষায় ও তাঁর মুক্তির দাবিতে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানান।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার ভারতের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বাংলাদেশের অসহায়, ভিটেমাটিহারা শরণার্থীদের জন্য। এসময় জনসংখ্যার সর্বাধিক চাপ লক্ষ করা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে। জীবনের মায়ায় দেশ ছেড়ে পালানো শরণার্থীদের থাকার জন্য ত্রিপুরার রাজ পরিবার তাদের প্রাসাদ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। রাজ্যের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার রাজ্য পুলিশের অস্ত্রাগার তুলে দিয়েছিল বাংলাদেশের নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল বাঙালি শরণার্থীদের আশ্রয়ের জন্য।

তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের জন্য ভারতের মতো এত ত্যাগ অন্য কোনো রাষ্ট্র করেনি।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের বক্তব্যে খুব সচেতনভাবে 'বাংলাদেশ' শব্দ উচ্চারণ করেন। ৬ই ডিসেম্বর লোকসভার ভাষণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি সর্বাত্মক সমর্থন দেন এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতাদেরকেও বাংলাদেশকে সমর্থন করতে ও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে পাকিস্তানকে চাপ প্রয়োগ করার জন্য সক্রিয় আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক শরণার্থী শিবিরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎকালে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয় ও রাজনৈতিক কাজ পরিচালনার সুযোগসহ সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন। শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে তিনি পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেন যে, বাংলাদেশিদের প্রতি এ অন্যায় দ্রুত বন্ধ না করলে ভারত চুপ করে থাকবে না।

শুধু নিজ দলের সঙ্গে মতবিনিময় নয়, ইন্দিরা গান্ধী তৎকালীন বিরোধী দলের সঙ্গেও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক সহায়তা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াই নয়, ইন্দিরা গান্ধী ছুটে গিয়েছেন শরণার্থী শিবিরে আশ্রিতদের খবর নিতে। এসময় ১৭ই মে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিও বলেন তিনি।

৫ই জুন ইন্দিরা গান্ধী মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। সামরিক ও বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথেও বাংলাদেশি শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কর্মকাণ্ডের প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও পুলিশপ্রধান প্রসাদ বসুর সঙ্গেও জরুরি বৈঠক করেন।

১লা জুলাই লন্ডনের *টাইমস* পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ইয়াহিয়ার নতুন পরিকল্পনা পূর্ব বাংলার অবস্থা আরও ভয়াবহ করে তুলবে। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব নেতাদের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন বার্তা পৌঁছে দেন।

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা দ্বারা ১৯৭১ সালে সারা ভারতজুড়ে গড়ে তুলেছিলেন এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য। তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন, যার মূল প্রেরণা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক দূরদর্শী ভূমিকা। বাংলাদেশের জন্য সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধী চষে বেড়িয়েছেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত।

বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরও ইন্দিরা গান্ধী এদেশের পাশে ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিমানে লন্ডন থেকে নয়াদিল্লি হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কিন্তু তাঁকে নিজ দেশে ফিরিয়ে আনতে তাঁর বাহন হিসেবে হিথ্রো বিমানবন্দরে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল একটি ভারতীয় বিমানও।

সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় কূটনীতিকদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আপনারা তো আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেনই। আমি যদি এখন ওদের বিমানে দেশে ফিরি তাহলে ওদের স্বীকৃতিরও আর কিছু বাকি থাকে না।' বঙ্গবন্ধুর এ কথা শোনার পর ইন্দিরা গান্ধী বিচলিত হননি। তিনি নয়াদিল্লিতে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতিকালে বীরোচিত সংবর্ধনা দেন।

এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে ভারত যান। এ সফরকালে তিনি তাঁর জন্মদিনের উপহার হিসেবে ভারতীয় সেনাদের দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন। ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে সায় দিয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাদের প্রত্যাহার করে নেন। প্রায় ১৭ হাজারেরও বেশি ভারতীয় সেনা মুক্তিযুদ্ধের সময় রক্ত দিয়েছিলেন এই বাংলাদেশের জন্য। বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক ইতিহাস আছে এক দেশের সেনা অন্য দেশে বছরের পর বছর থাকার কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সেনাদের প্রত্যাহার করে নিতে একবছরও সময় নেননি।

১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর দিল্লিতে নিজ বাসভবনে নিজ দেহরক্ষীরাই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাংলাদেশ হারালো তার এক অকৃত্রিম বন্ধুকে। বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাস যতদিন থাকবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ইন্দিরা গান্ধীর অবদানও ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাপিয়া সুলতানা পান্না: প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, আর. এস. আইডিয়েল কলেজ, কিশোরগঞ্জ

দুর্নীতি স্লোগান

এসো মিলে গড়ি দেশ
দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ

নিরাপদ মাতৃত্ব রক্ষায় চাই জনসচেতনতা

কাকলী ইয়াসমিন

মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে চায় সকল নারীই। একজন নারীর জীবনে পূর্ণতা আসে মাতৃত্বের মাধ্যমে। মাতৃত্ব তথা নিরাপদ মাতৃত্ব সকল মায়ের অধিকার। একজন নারী গর্ভধারণের পর থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার রাখেন। শুধু মা-ই নন, মায়ের গর্ভে বেড়ে ওঠা শিশুরও প্রয়োজন সমান যত্ন, যাকে বলা হয় গর্ভকালীন সেবা। নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু হ্রাস ও নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সকলকে সচেতন করার এবং এসব সমস্যা প্রতিরোধ করার প্রত্যয়ে ১৯৮৭ সাল থেকে ২৮শে মে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হয় আন্তর্জাতিক 'নারী স্বাস্থ্য দিবস'। মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব ও এর কার্যকারিতা অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২৮শে মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' ঘোষণা করেন এবং ১৯৯৮ সাল থেকে দেশব্যাপী জাতীয়ভাবে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। 'মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হবে যেতে' –প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর দেশজুড়ে পালিত হয় নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর আজিমপুরে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), দেশব্যাপী জেলা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৮শে মে থেকে ২রা জুন পর্যন্ত বিশেষ সেবা দেওয়া হয়। ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ১২ হাজার নারী গর্ভধারণ ও গর্ভধারণ সংক্রান্ত কারণে মারা যান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, শিশু জন্ম দিতে গিয়ে ২০২০ সালে ৮৮৪ জন নারী মারা গেছেন এবং ২০২১ সালে তা কমে ৭৮৮ জনে নেমে এসেছে। ২০১০ সালে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু ছিল ১৯৪ জন। গত এক দশকে তা কমে ১৬৫ জনে নেমে এসেছে।

গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে সব নারীর জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণই হলো নিরাপদ মাতৃত্ব। গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশ সরকার মিডওয়াইফের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং জরুরি প্রসবসেবাসহ প্রসবকালীন জটিলতায় সঠিক রেফারেল সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল-এর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশে উন্নীত করা এবং দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের হার ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত করা। পাশাপাশি মাতৃমৃত্যুর হার এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে চারবার গর্ভকালীন সেবা গ্রহণের হার ৩৭ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-ডব্লিউএইচও'র মতে, একজন মা গর্ভাবস্থা, প্রসব অবস্থা ও প্রসব-পরবর্তী ৪২ দিনের মধ্যে মারা গেলে ওই ঘটনাকে 'মাতৃমৃত্যু' হিসেবে গণ্য করা হয়। সংস্থাটি বলছে, প্রসবজনিত জটিলতায় সারা বিশ্বে প্রতিদিন ৮০০ মাতৃমৃত্যু হয়। এর ৯৯ শতাংশ মৃত্যুই উন্নয়নশীল দেশে হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে প্রতি লাখে জীবিত শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মাতৃমৃত্যু ১৬৫ জন, যা ২০০৯ সালে ছিল ২৫৯ জন। গত ১০ বছরে মাতৃমৃত্যু হার কমেছে প্রতি লাখে জীবিত শিশুর জন্মে প্রায় ৯৪ জন। গত ১০ বছরের পরিসংখ্যানে অনেক উন্নতি হয়েছে।

গর্ভকালীন সময় যা করণীয়

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা মা ও শিশু হাসপাতালে এসে গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে চার বার শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে; দুই ডোজ টিটি টিকা গর্ভধারণের ৪ থেকে ৮ মাসের মধ্যে মাকে নিতে হবে। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি করে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে; প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে; যে-কোনো ভারী কাজ ছাড়া অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজকর্ম করা যাবে; দিনের বেলায় কমপক্ষে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে; গর্ভবতী মাকে মানসিকভাবে শান্তিতে রাখতে হবে। এছাড়া গর্ভাবস্থায় যে-কোনো বিপদ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। যেমন– গর্ভাবস্থায় প্রসবের সময় বা পরে খুব বেশি রক্তস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, প্রসবের পর গর্ভফুল না পড়া; গর্ভাবস্থায় মাথাব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা ও প্রসবের সময় বা পরে চোখে পানি আসা; তিনদিনের বেশি জ্বর থাকা; ১২ ঘণ্টার বেশি প্রসব ব্যথা থাকা ও প্রসবের সময় শিশুর মাথা ছাড়া অন্য কিছু আগে বের হওয়া; গর্ভাবস্থায় প্রসবের সময় বা পরে খিচুনি হওয়া।

নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনার জন্য যা করণীয়

কোথায় কাকে দিয়ে প্রসব করানো হবে তা আগে থেকে ঠিক করে রাখা; রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে আগে থেকে ২-৩ জন রক্তদাতা ঠিক রাখতে হবে; জরুরি অবস্থায় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে গর্ভবতীকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য; গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই প্রয়োজনীয় টাকা জমিয়ে রাখতে হবে।

জাতীয় উন্নয়নে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা অপরিহার্য। এলক্ষ্যে সরকার গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মানসম্মত পরিচর্যা এবং রোগ প্রতিরোধে বাস্তবায়ন করেছে ব্যাপক কর্মসূচি। বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করেছে। নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাসে মিডওয়াইফরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সরকার মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সরকার বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। মাতৃস্বাস্থ্য এবং নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা এমডিজি-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। ২০০১ সালে প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু হার ছিল ৩২২ জন। ২০১০ সালে এই হার কমিয়ে ১৯৪-এ আনা হয় এবং বাংলাদেশ এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়। তাই ২০১০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এমডিজি পুরস্কার দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল। টেকসই উন্নয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু হার কমানোর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা, প্রসব-পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। তাই এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি চাই সকলের সহযোগিতা।

কাকলী ইয়াসমিন: প্রাবন্ধিক

‘মা’ একটি মধুর শব্দ

প্রশান্ত দে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের *ঝিঙেফুল* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিখ্যাত ‘মা’ কবিতায় তিনি লিখেছেন–

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও মধুর শব্দের নাম ‘মা’। মাত্র এক অক্ষরের এই শব্দটি আমাদের যেভাবে তৃপ্ত করতে পারে, আর কিছু তা পারে না। চিরন্তন একটি আস্থা-আশ্রয়ের নাম হলো মা। এই মা শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে মুঠোভরা স্নেহ, মমতা আর অকৃত্রিম ভালোবাসা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মা, মায়ের বৈশিষ্ট্য আর ভালোবাসা কখনো বদলায় না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আরেক জনপ্রিয় কবি কাজী কাদের নেওয়াজ তাঁর রচিত ‘মা’ কবিতায় অপূর্বভাবে পঙ্‌ক্তি চয়ন করেছেন–

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নামটি মধুর
তিন ভুবনে নাই।

সত্যিই, ‘মা’ শব্দটি অতি ছোটো কিন্তু এই শব্দের মাঝে যে একটা প্রশান্তি রয়েছে তা আর কোনো কিছুতে নেই। সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে আমাদের যে অস্তিত্ব আজ, তার একমাত্র সূত্রপাত মাতৃগর্ভে। দীর্ঘ দশমাস গর্ভধারণ করে নিঃস্বার্থ যন্ত্রণা বরণ করে একটি প্রাণকে জন্মদান করেন এই ‘মা’। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে তাকে বড়ো করে তোলা পর্যন্ত একজন মা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাই বলা হয়, মা সন্তানের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও বড়ো বন্ধু। লোকবরেণ্য বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন, ‘মা হলো পৃথিবীর একমাত্র ব্যাংক, যেখানে আমরা আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট জমা রাখি এবং বিনিময়ে নেই বিনাসুদে অকৃত্রিম ভালোবাসা।’ ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন, তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো।

প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মা দিবস (Mother’s Day) উদ্‌যাপন করা হয়। ২০২২ সালে মা দিবসের দিন ৮ই মে। সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও প্রতিবছর মা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

মা দিবসের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। ঠিক কবে থেকে মা দিবসের সূত্রপাত হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় দিনটির সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিক দেবী সিবেলের কাছে অর্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে মায়ের আরাধনা করা হতো। রোমে ১৫ই মার্চ থেকে ১৮ই মার্চের মধ্যে আইডিস অব মার্চ নামে একটি উৎসব হতো মায়ের জন্যই। প্রাচীন রোমানরা দেবী জুনোর প্রতি উৎসর্গ করে একটি ছুটির দিন বানিয়েছিল, যে দিন মায়েদের উপহার দেওয়া হতো। ইউরোপে ‘মাদারিং সানডে’ ছিল বলে জানা যায়। একটি নির্দিষ্ট রবিবারকে আলাদা করে রাখা হতো মাতৃত্বকে সম্মান জানানোর জন্য। এই দিনে মাকে উপহার দেওয়া, মায়ের তথা মেয়েদের প্রতিদিন করতে হয় দৈনন্দিন ঘরের যেসব কাজ, তা বাড়ির অন্যরা করে দেওয়ার চর্চা ছিল। ১৮৭০ সালে জুলিয়া ওয়ার্ড হোই লিখলেন ‘মাদার্স ডে প্রক্লেমেশন’ বা ‘মা দিবসের ঘোষণাপত্র’। সমাজকে গড়ে তুলতে নারী দায়িত্ব পালন করেন, এই বোধকে বিশ্বাসে পরিণত করাই ছিল এই ঘোষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য।

সর্বপ্রথম ১৯১১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রোববার আমেরিকা জুড়ে ‘মাদারিং সানডে’ নামে একটি বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯১২ সালে মা দিবস পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে ‘মাদারস ডে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোশিয়েশন’ বা ‘আন্তর্জাতিক মা দিবস সমিতি’ স্থাপনের মাধ্যমে, যার নেপথ্যে ছিলেন আনা জার্ভিস (১৮৬৪-১৯৪৮)। আনা জার্ভিস হলেন আমেরিকার মাদার্স ডে-এর প্রতিষ্ঠাতা। আনা মারিয়া রিভস জার্ভিস এই কাজে কেন নামলেন তার পেছনে একটি ঘটনা আছে। মা অ্যান মারিয়া রিভস জার্ভিস ছিলেন শান্তিকামী একজন মানুষ। সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। ‘মাদারস ডে ওয়ার্ক ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মা। ১৯০৫ সালে তাঁর মৃত্যু হলে মেয়ে আনা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে মায়ের অসমাপ্ত কাজ করতে শুরু করেন। সব মাকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি দিবস হলে মন্দ হয় না, এই চিন্তা তখন তাঁর মাথায় এল। তাঁর গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক মা দিবস সমিতির প্রচেষ্টায় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস হিসেবে পালিত হওয়ার রীতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে মা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবেও ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি পরিবার মাকে সম্মান করুক, এই আহ্বান ছড়িয়ে যায় বিশ্বময়।

মা দিবস মানে যে শুধু এই দিবসটিতেই মাকে স্মরণ করতে হবে বা মাকে ভালোবাসতে হবে তা নয়। দিবসটি মায়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সারা বিশ্বে পালিত হয়। মায়ের প্রতি দায়িত্ব সারা জীবনের, প্রতিটি দিনের ও প্রতিটি মুহূর্তের। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান মায়েরা শুধু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মায়েরা এখন কর্মক্ষেত্রেও বিচরণ করছেন। স্বামী, সন্তান, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দৈনন্দিন খেয়াল, যত্ন নিয়েও পরিবারে আর্থিকভাবে অবদান রেখে চলেছেন মায়েরা। অতীতের তুলনায় মায়েদের দায়িত্ব, কায়িক শ্রমও বেড়েছে। তবুও মায়েরা যেন অভিযোগহীন এক আলোকবর্তিকা। তাই একজন মা শুধু মা-ই নন, তিনি একজন যোদ্ধা।

মা দিবসে সন্তানেরা মায়েদের জন্য বিভিন্ন গিফট, মাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি, আনন্দ করে থাকে। শুধু তাই নয়, বাবারাও তাদের স্ত্রীর প্রতি সম্মান রাখেন এ দিনে। বিখ্যাত লেখক কমলা ভাসিন লিখেছিলেন, মাতৃত্ব আসলে একটি বোধ। এই বোধ যার আছে, তিনিই মা। কমলা ভাসিন এও বলেছেন, পিতৃত্বও একটি বোধ। এই বোধ যার আছে, তিনিই পিতা।

পরিশেষে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘নারী’ কবিতার দুটি লাইন লিখে শেষ করতে চাই, যা প্রতিটি মানুষের কাছেই অনুপ্রেরণার উৎস। তা হচ্ছে– ‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’ পৃথিবীর সকল মায়েদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

টাইগার নাজিরের অন্তর্ধান

রফিকুর রশীদ

আজ দুদিন ভারি মজার এক খেলা পেয়েছে অঙ্কন। সেই খেলা নিয়ে বেশ আনন্দেই আছে সে। বাবার বুক শেলফ থেকে বই নামানোর খেলা। এ খেলার কোনো নাম নেই, কিন্তু মজা আছে। বাবাকে কাছে পাবার মজা। দু-তিন দিন আগে শোকেস থেকে থালাবাসন, খেলনাপাতি, কাপড়চোপড় নামিয়ে খালি করা হয়েছে। অঙ্কনের মা একা হাতে সামলেছে সেসব। কিন্তু অঙ্কনকে মোটেই হাত লাগাতে দেয়নি। অথচ বুক শেলফ খালি করার সময় বাবা নিজে থেকে তাকে ডেকে বলেছে,

আমাকে একটু হেল্প করবি অঙ্কন?

এমন আহ্বান শুনে তো সে মহাখুশি। ইশকুলে চলছে করোনাকালীন ছুটি। লকডাউনের মধ্যে বাইরে যাওয়াও যাবে না। একনাগাড়ে ঘরের ভেতরে সময় কাটে কী করে! এ সময়ে বাবাকে হেল্প করতে পারলে তো ভালোই হয়। অঙ্কনের বাবা নাজির মাহমুদ ছবি আঁকে, পটশিল্পী, কেউ কেউ বলে পটুয়া। বাবার ছবি আঁকা দেখতে খুব ভালোলাগে অঙ্কনের। বাবাকে হেল্প করা মানে রংতুলিটা এগিয়ে দেওয়া, ইজেলটা বাড়িয়ে ধরা, এই রকম টুকিটাকি। এসব হুকুম পালন করতেও ঢের আনন্দ তার। লাফিয়ে এসে বাবার কাছে সে জানতে চায়–

কী হেল্প বাবা?

অঙ্কনের বাবা বুক শেলফ থেকে একটা বই নিয়ে ছেলের দিকে বাড়িয়ে দেয়,

নে, ধর। এটা নামিয়ে রাখ ওই ঘরের মেঝেতে।

অবাক হয় অঙ্কন, এটাই হেল্প করা নাকি! আজ তাহলে রংতুলির কাজ নেই!

কী যে হয়েছে, তার বাবাকে অনেকদিন ছবি আঁকতেই দেখা যায় না। মায়ের না হয় ইশকুল বন্ধ,তাই বলে বাবার আঁকাআঁকি তো বন্ধ হতে পারে না। অঙ্কন কলম ধরা শিখেছে তার মায়ের কাছে, আর তুলি ধরতে শিখিয়েছে তার বাবা। কত দিন সেই রংতুলির চর্চাই হচ্ছে না। বাবার হুকুম শুনে আজও হতাশ হয় অঙ্কন। তবু হাত বাড়িয়ে বইটা ধরে, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে–

মেঝেতে মানে ঠিক কোথায় বই রাখতে বলেছে তার বাবা। নাজির মাহমুদ প্রায় অকারণেই ফিক করে হেসে ছেলেকে নির্দেশ দেয়,

তোশকের পাশে দেয়াল ঘেঁষে রেখে দে অঙ্কন।

অঙ্কন সেটা ঠিকমতো রাখতেই বাবার হাতে আবার বই, বাবা বলে,

নে এটা ধর। রাখ ওর পাশে।

এরপর অঙ্কন ঠিকই বুঝে যায় হেল্প করা মানে বাবার বই বুক শেলফ থেকে নামিয়ে মেঝেতে রাখা। শোবার খাটটা কয়েকদিন আগে ঘর থেকে বের করে ফেলার কারণে মেঝেটাই অনেক প্রশস্ত মনে হচ্ছে। নাজির মাহমুদের ইচ্ছে বইগুলো নামিয়ে ঘরের মেঝেতেই দেয়াল ঘেঁষে সাজিয়ে রাখবে। এ কাজে অঙ্কন সহযোগিতা করায় তারও খুব ভালোলাগে। আবার এই গৃহবন্দি দুঃসহ দিনে নয় বছরের অঙ্কন বই সরানোর কাজে হাত লাগিয়ে প্রবল আনন্দ পায়। তার মনে হয় অনেক দিন পর সে বাবার সঙ্গে মজার এক খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। সেই খেলা খেলতে খেলতে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে,

আমাদের টেলিভিশনের কী হলো বাবা?

এ সময়ে নাজির মাহমুদের হাত থেকে একটা মোটা বই পড়ে যায় নিচে। অঙ্কন দ্রুত হাতে সেই বই তুলতে তুলতে বাবার মুখের দিকে তাকায়। লজ্জা ঢাকতে গিয়ে বাবার মুখে ফুটে ওঠে বিষণ্ন হাসি। অঙ্কন আবারও শুধায়,

আজও সেটা মেরামত হয়নি?

এতক্ষণে নাজির মাহমুদের মনে পড়ে যায়– কবে যেন টেলিভিশন মেরামতের গল্পই সে বলেছিল। সেই গল্পের লেজ ধরেই এবার বলে,

কী মুশকিল, লকডাউন চলছে যে!

তা বটে। লকডাউনের কারণে সব দোকানপাট বন্ধ। টেলিভিশন মেরামত হবে কেমন করে! হাতের কাজ করতে করতে নাজির মাহমুদ মনে করিয়ে দেয়–

এই লকডাউনের পর মামাবাড়ি গিয়ে সে বড়ো পর্দার টেলিভিশন দেখতে পাবে। ঢাকা ছেড়ে অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয় না। মামাবাড়ি যাবার কথা অনেক দিন থেকে চলছে বটে, এ নিয়ে মা-বাবার মধ্যে বেশ তর্কাতর্কি হতেও শুনেছে অঙ্কন। তাই নিশ্চিত হবার জন্যে সে জিজ্ঞেস করে,

সত্যি আমরা মামাবাড়ি যাচ্ছি তাহলে!

বাবা এক গাল হেসে জানায়,

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে তোমাদের রেখে আমি আবার চলে আসব ঢাকায়।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে অঙ্কনের মামাবাড়ি। দূরত্বের কারণে হোক, অথবা অন্য কোনো অসুবিধার জন্যেই হোক, অনেক দিন সেখানে যাওয়া হয় না। তাই বলে এবার এমন এন্তার সুযোগ পাওয়া যাবে, এ কথা কে কবে ভাবতে পেরেছে! আনন্দে ডগমগো হয়ে সে জানতে চায়,

আমরা তাহলে কবে যাচ্ছি বাবা?

বাপরে বাপ! মামাবাড়ির কথায় আর তর সইছে না কেমন?

অঙ্কন একটা লাজুক হাসি দিয়ে বাবার বুকের কাছে এগিয়ে আসে। হাতে বই ধরিয়ে দিয়ে বলে,

লকডাউন শেষ হোক, তারপরই চলে যাব পার্বতীপুর, দেখিস।

দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে মনোযোগ দেয় অঙ্কন। ছোট্ট এই ড্রয়িংরুমের বুক শেলফ খালি হয়ে যাচ্ছে। বই নিয়ে যাচ্ছে শোবার ঘরে দেয়ালের পাশে। ঘরের মেঝেতে গুছিয়ে রাখছে। বই বহন করতে করতে এতক্ষণে তার মনোযোগ পড়ে ড্রয়িংরুমের দেয়ালে টানানো বাবার আঁকা ছবির দিকে। দেয়াল জোড়া বেশ কয়েকটা বাঘের ছবি। এই ছবিগুলোর মধ্যে কী যে বিশেষ পার্থক্য আছে, ছোট্ট অঙ্কন তা ধরতে পারে না। কিন্তু এ বাসায় যারা বেড়াতে আসে, তাদের মধ্যে অনেকেই তফাৎ বুঝতে পারে। ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুলের লিখন আঙ্কেল তো প্রত্যেক বার মনে করিয়ে দেয়– এই জন্যেই তো লোকে তোমাকে টাইগার নাজির বলে। শিল্পী নাজির মাহমুদ বিব্রত বোধ করে, লাজুক মুখ নামিয়ে বলে, মাথা খারাপ! টাইগার হওয়া অতই সোজা! বললেই হলো!

লিখন আঙ্কেল তার বন্ধুকে খোঁচায়,

তাহলে এত বাঘের ছবি আঁকো কেন?

অঙ্কনের বাবা অবলীলায় জানায়, আমি সাতক্ষীরার শরণখোলার মানুষ। সুন্দরবনের আঁচলের তলে জন্ম, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে বসবাস, বাঘ নিয়ে আমার অন্য রকম আনন্দ, অন্য রকম অহংকার। সেই জন্যে আমি নানাভাবে বাঘের ছবি আঁকি, বাঘের ভেতরের নানান অভিব্যক্তি ফোটাতে চেষ্টা করি।

অঙ্কনের কাঁধে থাবা দিয়ে লিখন আঙ্কেল বলে,

এই যে বাঘের বাচ্চা বাঘ, শুনলে তোমার বাপের বক্তৃতা! বন্ধুকেও সে রীতিমতো উৎসাহ দেয়– একদিন তুমি সত্যিই টাইগার হয়ে যাবে ফ্রেন্ড। বাঘ নিয়ে এমন গভীর কথা তো কোনোদিন শুনিনি, ভাবিওনি।

নাজির মাহমুদ হা হা হেসে জানায়,

প্রত্যেক বাঙালিই কিন্তু টাইগার বন্ধু। তুমিও রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

হাসির গমকে লিখনেরও কাঁধের ওপর বাবরি চুল দুলে ওঠে।

বড়োদের আলোচনার মধ্যে অঙ্কনও বেশ মাথা গলিয়ে দেয়, মনে করিয়ে দেয়,

সাকিব, মুশফিক, তাসকিন– সবাই তো আমাদের টাইগার।

লিখন আঙ্কেল হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, সাবাশ বেটা! এই জন্যেই তো আমি বাঘের বাচ্চা বাঘ বলি!

দেয়ালের গায়ে টানানো বাঘের ছবি–

ছবিগুলোর ওপরে চোখ রেখে অঙ্কন শুধায়,

তোমার এই ছবিগুলোও কি নামিয়ে ফেলতে হবে বাবা?

হঠাৎ নাজির মাহমুদের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে, যেন ভূমিকম্পে দুলে ওঠে সারা শরীর। নিজের আঁকা ছবি, সংগ্রহ করা বই আর নানান প্রদর্শনী ক্যাটালগ– সবই তো সে বিক্রি করতে চায়। অঙ্কন কি তবে কথা কোনোভাবে টের পেয়ে গেল! ওকে আড়াল করেই খাট-শোকেস-ডাইনিংসেট বেরিয়ে গেছে বাসা থেকে। ওর মায়ের শখের হারমোনিয়াম কিংবা টেলিভিশন আর কখনোই বাজার থেকে বাসায় ফিরবে না। তবু শেষরক্ষা হলো কই! বাড়িওয়ালা চূড়ান্ত নোটিশ দিয়ে গেছে তিন মাসের বকেয়া ভাড়া শোধ করে বাসা ছাড়তে হবে এ মাসেই। অঙ্কনকে আড়াল করে সেই তোড়জোড়ই চলছে কয়েক দিন থেকে। মা-বাবার আশঙ্কা– কখন যে ধরা পড়ে যায় ছোট্ট শিশুটির কাছে!

শিল্পী নাজির মাহমুদ বুক শেলফ থেকে বের করা বই নিচে নামিয়ে

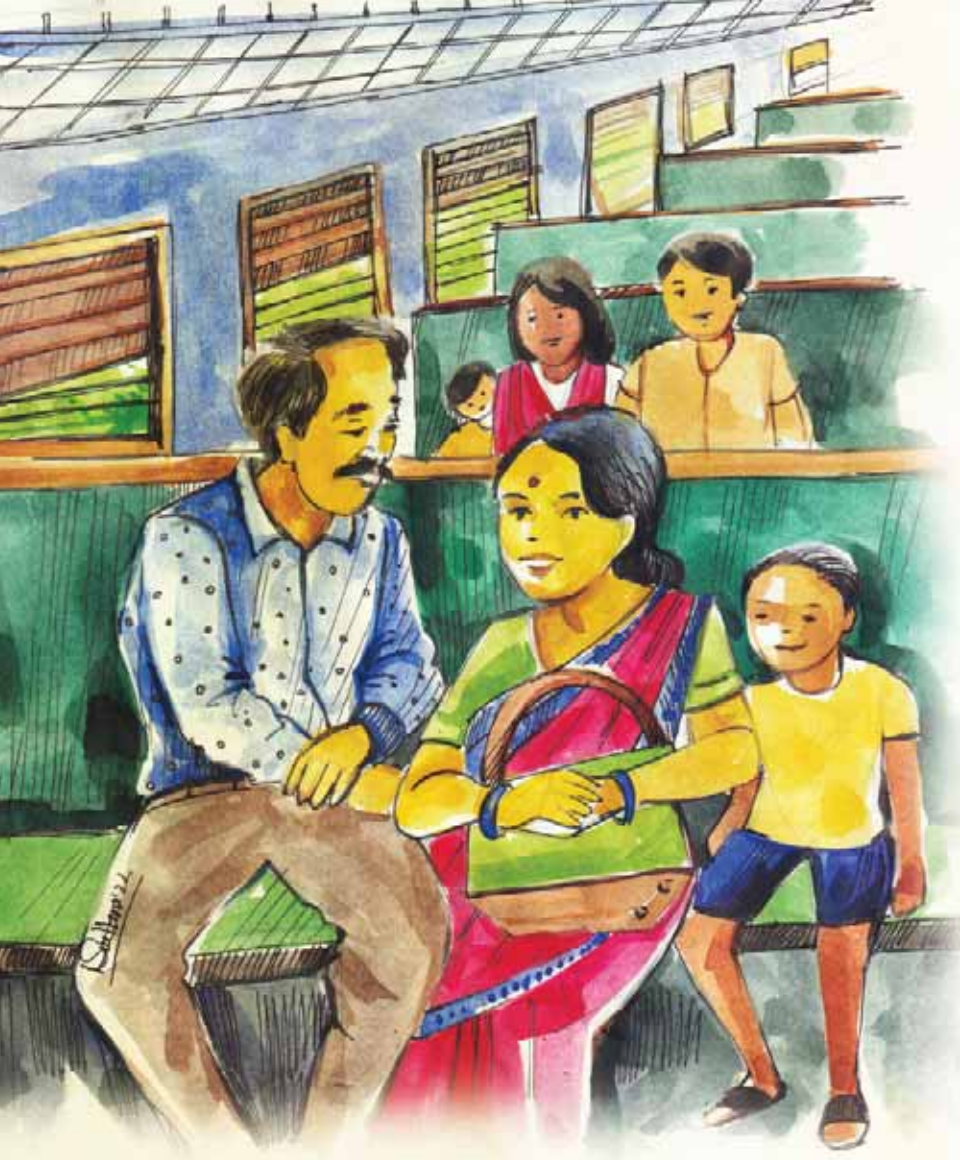

রেখে নিজের আঁকা বাঘের ছবিগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ছেলেকে বলে,

না না, আপাতত ওগুলো থাক।

অঙ্কন জিজ্ঞেস করে,

এই ছবিগুলো তুমি বিক্রি করবে না, বাবা?

নাজির মাহমুদের ছবি বিক্রির বিষয়টা কারও অজানা কিছু নয়। এটাই তার জীবিকার প্রধান অবলম্বন। প্রদর্শনী থেকেই কত ছবি বিক্রি হয়ে যায় উচ্চমূল্যে। দেশে-বিদেশে এ নাগাদ তার বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছে বিভিন্ন গ্যালারিতে। মাথায় জাতীয় পতাকার ব্যান্ড বাঁধা অবস্থায় নাজির মাহমুদের সহাস্য ছবিসহ প্রদর্শনীর ভালো কাভারেজ ছাপা হয়েছে কাগজে, ইলেকট্রনিক মিডিয়াও যথেষ্ট কাভার করেছে। গুলশান বনানীর কোনো কোনো দূতাবাসেও তার ছবি বিক্রি হয়েছে। অথচ এই শেষবেলায় ...

ড্রয়িংরুমের ছবি বিক্রির কথায় ছেলের সামনে কেন যে এভাবে চমকে ওঠে শিল্পী নাজির, কে বলবে সেই কথা!

প্রকৃতপক্ষে করোনার এই দুঃসময়ে ছবি কেনার মানুষ পাওয়া ভার। এক সময় চারুকলার সামনে দাঁড়িয়েই কত ছবি বিক্রি হয়েছে। পটুয়া নাজিরের হাতের বাঘ নিয়ে কাড়াকাড়ি পর্যন্ত হয়েছে। এখন পেটের দায়ে সেই বাঘের পট বিক্রির ঘোষণা দিয়েও লোক পাওয়া যায় না। এ এমনই দুঃসময়! কিন্তু এসব কথা অঙ্কনকে না বলে নাজির মাহমুদ কৌশলে জানিয়ে দেয়,

কত ছবিই তো বিক্রি করেছি এ জীবনে, এগুলো থাক। এর মধ্যে দুটো ছবি তুই বরং তোর মামার জন্যে নিয়ে যাস। সেটাই ভালো হবে।

এ প্রস্তাবে অঙ্কন মহাখুশি। সুযোগ বুঝে সে আরও এক বাড়তি প্রস্তাব দিয়ে বসে,

আর ছোটোখালার জন্যে একটা নিলে হয় না বাবা?

নিবি?

একটা ছবি নেব বাবা। ছোটোখালা খুব খুশি হবে।

কিন্তু তোর খালু তো খুশি হবে না। ছবি-টবি একদম পছন্দ করে না সে।

তা হোক। লামিয়া আছে যে!

ফিক করে হেসে ওঠে অঙ্কনের বাবা। ভারি এক চিত্র-সমঝদার পাওয়া গেছে! অঙ্কনের চেয়ে দুবছরের ছোটো লামিয়া, ওর খালাতো বোন। তার জন্যে প্রিয় উপহার হিসেবে একটা ছবি তো নেওয়াই যায়। হাসিমুখে সম্মতি দেয় বাবা–

তাহলে নিস একটা।

আনন্দে আটখানা হয়ে অঙ্কন দুম করে প্রস্তাব দিয়ে বসে,

আমরা কিন্তু ট্রেনে যাব বাবা।

ট্রেনে যাবি?

হ্যাঁ, খুব মজা হবে। মাও কিন্তু রাজি।

তাই নাকি! মায়ের সঙ্গেও যুক্তি হয়ে গেছে?

ট্রেনে যাওয়াই ভালো বাবা। অঙ্কন বেশ যুক্তি দেখায়, তোমার ছবি-টবি নেবারও সুবিধা হবে।

হা হা করে উচ্ছৈঃস্বরে হেসে ওঠে অঙ্কনের বাবা। ছেলেকে বলে,

আমার ছবি নেওয়াটাই বড়ো হলো তাহলে! আচ্ছা বেশ, তবে ট্রেন জার্নিই হবে, যা।

খুশিতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে অঙ্কন। হাতের বই দেখিয়ে বাবা মনে করিয়ে দেয়,

আমাদের বই সরানোর কাজ কিন্তু অর্ধেকও হয়নি অঙ্কন মাহমুদ।

অঙ্কনও বেশ পাকামো করে উত্তর দেয়,

হবে হবে। আজ না হোক কাল সারা হবে। চিন্তা করো না তো!

পুত্র যখন আশ্বস্ত করে, তখন পিতার আবার ভাবনা কীসের! নাজির মাহমুদ সস্নেহে পুত্রের কাঁধে হাত রেখে জানায়– এই জন্যেই তো আমার ছেলেটাকে সবাই গুড বয় বলে!

অঙ্কন হেসে বলে, কই থামলে কেন! বই নামিয়ে দাও!

একদিনে এত কাজ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাবি যে!

অঙ্কন খুব মজার জবাব দেয়–

এসব গুছিয়ে তারপর মামাবাড়ি যেতে হবে না!

ওরে পাজি! তাহলে মামাবাড়ি যাবার জন্যে তোমার এত তাড়াহুড়ো?

হাতের বই দেয়ালের পাশে রেখে এসে অঙ্কন বলে,

না বাবা, তা নয়।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বাবা। ছেলে মনে করিয়ে দেয়,

আমরা তো মামাবাড়ি যাব এবারের লকডাউনের পরে।

সেটা মনে আছে তাহলে!

আমি একটা কথা বলব বাবা?

একটা কেন, হাজার কথা বলবি তুই।

তার আগেই যদি নতুন ভাড়াটে চলে আসে এ বাসায়!

নাজির মাহমুদের হাত থেকে আবার খসে পড়ে মোটা একটা বই। পুরানো বই বলে পুটের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। তাই মেঝেতে পড়া মাত্র বইয়ের পাতা ছিটিয়ে যায়। নাজির মাহমুদ ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে– অঙ্কনের চোখে কিছুই এড়ায় না তাহলে! হোক উঁচুতে, তবু বাসার সামনে লটকে দেওয়া 'টু-লেট' তার নজরেও পড়েছে! বাকরুদ্ধ হয়ে যায় নাজির মাহমুদের।

ঢাকায় বাসা ভাড়া হওয়া এখন সোজা নয়। মানুষ এখন ঢাকা ছাড়ছে। সর্বস্ব খুইয়ে দাঁতে দাঁত পিষে থাকার পরও এই দুঃসময়ে আর টিকে থাকতে না পেরে নাজির মাহমুদের মতো অনেকেই রণাঙ্গন ছেড়ে পালাচ্ছে। তবু হয়ত একদিন এই 'টু-লেট' নামানো হবে, নতুন কোনো ভাড়াটে আসবে। সে হয়ত জানবেই না– দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এইটুকু ছাদের নিচে কোনো এক শিল্পী দম্পতি অসংখ্য স্বপ্ন রচনা করেছিল, একজন ছবি এঁকে আর একজন গান গেয়ে এ বাসার দেয়ালে দেয়ালে মধুময় স্বপ্নের আবির ছড়িয়েছিল, কোনো এক অবুঝ বালক সেই স্বপ্নসমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে বেড়ে উঠছিল। কেউ জানবে না এসব স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের কথা। বুক শেলফের গ্লাস টেনে দিয়ে নাজির মাহমুদ হাতের ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে ছেলেকে বলে, আজ এইটুকুই থাক বাবা, ভাড়াটে আসতে দেরি আছে।

দুই.

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন।

অঙ্কনরা খুব ভোরবেলা চলে এসেছে স্টেশনে। বাপরে বাপ! সকালবেলা একের পর এক এতগুলো ট্রেন যে ছেড়ে যায় এখান থেকে সে তথ্য জানা ছিল না অঙ্কনের। বিস্ময়ের সঙ্গে বিভিন্ন গন্তব্যের ট্রেনগুলো সে দেখে। সিটি বাজিয়ে একে একে চলে যায় ট্রেনগুলো। এই দৃশ্য দেখে সে খুব আনন্দ পায়। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেন দেখিয়ে বাবা বলে, চলো, এটাই আমাদের ট্রেন। মায়ের হাত ধরে উঠে পড়ো।

বিক্রি কিংবা বিতরণ করে হোক, অথবা এখানে সেখানে ছড়ানো-ছিটানোর পরও পনেরো বছরের সংসারের টুকিটাকি এটা-সেটা বাঁধা-ছাঁদা করে সাকুল্যে ব্যাগ-ব্যাগেজ নিতান্ত কম হয়নি। নাজির মাহমুদ সেসব লাটবহর গুছিয়ে নিজেদের কামরায় তোলার পর সব শেষে বিশেষ যত্নে নিয়ে আসে বাঘের ছবি তিনটি। খুব কায়দা করে মাথার উপরে বাঙ্কারে রাখা হয় সেই ছবি। অঙ্কন তখনই দুহাতে তালি বাজিয়ে বলে ওঠে– কী মজা! কী মজা! বাঘ চলেছে মামাবাড়ি।

ট্রেন ছাড়তে তখনও খানিক দেরি।

অঙ্কনের মা ব্যাগ-ব্যাগেজের তদারকি শেষে শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বলে,

বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চা চলেছে মামাবাড়ি।

ফিক করে হেসে ফেলে অঙ্কন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়,

লিখন আঙ্কেলের কথা মা জানল কেমন করে!

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শিল্পী নাজির মাহমুদ বলে,

আমিই যদি বাঘ না থাকি, তুই কেমন করে বাঘের বাচ্চা হবি?

অঙ্কনের মা জিজ্ঞেস করে,

লোকে আর টাইগার নাজির বলবে না তো!

কী যে বলো রূপা, টাইগার হওয়া অতই সোজা ?

নাজির মাহমুদ এরপর নিজে থেকেই বাঘ বিষয়ক বিবরণ দেয়। সে জানায় বাংলার বাঘ ছিলেন শেরে বাংলা, এই বাংলাদেশের অহংকার। ওপার বাংলায় ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নাম শুনেছ? কীসের টাইগার নাজির! বললেই হলো! বাঘ কখনও পিছিয়ে আসে!

বাঘ বিষয়ক এই বিবরণ আশপাশের দু'চারজন যাত্রীও কান খাড়া করে শোনে। একজন বয়স্ক যাত্রী, মাথায় চুল নেই, ঠোঁটের উপরে তার সাদা ঘন গোঁফ, নাজির মাহমুদের দিকে আঙুল তুলে বলেন,

একাত্তরে আমরা আরও এক টাইগারের নাম শুনেছি ভাইয়া, তিনি নিজেই নিজেকে টাইগার নিয়াজী বলতে ভালোবাসতেন।

অচেনা এক সহযাত্রীর কথাতেও যেন বড্ড মজা পায় শিল্পী নাজির মাহমুদ। হো হো করে হেসে তার সঙ্গে যোগ করে– নিয়াজীও টাইগার! হুঁ! টাইগার! সে হলো পিছিয়ে আসা টাইগার। রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি, তার আবার তর্জন গর্জন!

এরই মাঝে তীব্র স্বরে সিটি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়। কামরার ভেতরের কথা বার্তা বিশেষ শোনা যায় না। তবু সেই ভদ্রলোক ভাঙা টিন বাজাবার মতো বলেই চলেছেন– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী যেন বিরাট ভূমিকা পালন করার সুবাদে 'টাইগার' হয়েছিলেন নিয়াজী।

দিনের শেষে পার্বতীপুরের মাটিতে পা দিয়েই নাজির মাহমুদ স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে পুনর্বার ঘোষণা করে– তোমাদের রেখে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ঢাকায় ফিরে যাব রূপা। একটা মেস-টেস দেখে উঠে পড়ব। লড়াইটা আমি ঢাকা থেকেই করতে চাই।

রূপার দুচোখ ছলছল করে ওঠে। স্বামীর প্রস্তাবের সমর্থনে সে জানায়–

আচ্ছা, তাই হবে। তুমি আমাদের টাইগার নাজির, পিছিয়ে আসবে কেন!

অঙ্কন কিছুই বলে না। বাবার আঁকা বাঘের ছবি আগলে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

শুদ্ধাচার স্লোগান

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

বিশ্বজয়ী ঋষি

শাফিকুর রাহী

মহান তুমি তোমার ধ্যানে সৃষ্টি সুখের আশায়
চলতে পথে থমকে দাঁড়াই, আমায় কাঁদায়-হাসায়।
তুমি মহান কালান্তরে কালেরই সাম্পানে–
জ্বালাও তুমি জ্ঞানের পিদিম অরণ্য উদ্যানে।
তোমার অসীম বিশ্বগীতি চন্দ্র-কিরণ আভায়,
পথহারা এক নগরবাউল সন্ন্যাসীকে ভাবায়।

পিয়াল বনে শিয়াল মাতে হাওয়ায় পাতা দোলে
উড়ু উড়ু ফুলপরীরা লুকোয় মেঘের কোলে।
বিশ্বজয়ী রবি তুমি উদার উদাস মনে,
সুখ-দুখেরই চন্দ্রিমা ফুল আঁকো সংগোপনে।
বেলি বকুল জুঁই চামেলি নাচলো তোমার সঙ্গে,
চতুর্দিকে আনন্দবান বইলো সোনার বঙ্গে।

উঠলো হেসে আকাশ বাতাস বিশ্ববাসী সবে
নোবেল জয়ী কবিগুরুর মহা সে উৎসবে।
প্রাণে প্রাণে মাতলো সবে প্রীতি মহানন্দে,
বাবুই, দোয়েল, বুলবুলিরা নাচলো দারুণ ছন্দে।
অজানা ভয় প্রলয় মাঝে গর্ব-গরিমায়,
কার তালাশে দিবস-রাতি পক্ষিরাজের নায়;

মনহরণের কোন সে জাদু মায়াবী স্পর্শে;
বসুন্ধরায় সুখ মহিমায় সৃজনধারা বর্ষে।
নদীর বুকে কীসের খোঁজে ভাসাও জীবনতরী,
তোমার রূপসা নদে এখন খেলে না ফুলপরী।
মানব নামের দানবরা আজ নদীর ঊর্মি-গ্রাসে,
পাহাড় বৃক্ষ সবুজ নাশে অমানবিক ত্রাসে।

কোন মায়ালু মন্ত্রটানে প্রাণের মমতায়;
সৃষ্টিসুখে স্বপ্নে তোমার রাত্রি কেটে যায়।
জমিদারি শান-শওকত ফেলে সুখের নিবাস
বসত গড়ো জলের উপর পদ্মাবোটে বাস–
সুখে-দুখে নদীর কান্না শুনতে নাকি তুমি;
তোমার মনোদুখে কাঁদে বঙ্গ-হৃদয় ভূমি।

তোমার গানে তোমার সুরে বাতাস বাজায় বাঁশি,
অমর তোমার জ্ঞানগরিমা বিশ্বজয়ী হাসি।
বাংলা মায়ের আশার প্রদীপ তুমিই প্রথম জ্বালো
মধুর সকল সৃষ্টিগাথায় দূর করো সব কালো
মনভুলানো প্রাণভুলানো গান-কবিতার টানে,
নেচে ওঠে ভোরের পাখি সুখ-আনন্দ বানে।

পঁচিশ বোশেখ কবিগুরু– তোমার জন্মদিনে
মেঘলাকাশে উঠলো রবি কালবোশেখির দিনে।
মহান তুমি বিশ্বলোকে আজও মহীয়ান,
এমন দিনে জীবন জাগায় তোমার মহান গান।
গীতবিতান গীতাঞ্জলির জাদুকরী সুরে
মন্ত্রমুগ্ধ অমর গীতি বাজে অন্তঃপুরে।

মে দিবসের কথা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

আগের দিনে শ্রমিকেরা খাটতো দিবারাত্র
শ্রম দিয়ে সে শ্রমের মূল্য পেত যে নামমাত্র
স্বাধীনতা ছিল না তো বাদ-প্রতিবাদ করার
অধিকারও তার ছিল না একটু নড়াচড়ার।

ছিল না যে কাজের কোনো সময় ধরাবাঁধা
কারখানাতে খাটতো যেন পোষ্য পশু-গাধা
মালিকেরা পাষাণ ছিল করতো শোষণ শ্রম
সেই সে শ্রমের মূল্য দিতো অল্প যে একদম।

দুর্বিষহ জীবন নিয়েই খাটতো শ্রমিকশ্রেণি
অপরিসীম কষ্ট হলেও থাকতে হতো ধ্যানী
এত খেটেও মর্যাদা-মান সে পেতো না তবু
মালিক মানেই মাথার ওপর অন্নদাতা প্রভু।

খুব নীরবেই সহ্য তারা করতো এসব নীতি
মনে ছিল যখন-তখন কাজ হারানোর ভীতি
তাই প্রতিবাদ না করে সে শুধুই খেটে যেত
ঘাম ঝরিয়ে ঘামের মূল্য খুব সামান্য পেত।

মালিকশ্রেণির কাছে তবু পাত্র ছিল ঘৃণার
ফিরছেই না স্বপ্নদেখা আনন্দিত দিন আর
অবহেলা আর শোষণেই ক্ষুব্ধ হওয়ার পর
হঠাৎ তাদের বুকে জাগে অশান্ত এক ঝড়।

শ্রমিকশ্রেণি ঐক্য-বাঁধন যেই-না করে দৃঢ়
বক্ষ তখন হয় টানটান, উচ্চে ওঠে শিরও
চাইল তারা প্রতিদিনের কাজের সময়সূচি
পালটে গেল সাহস এবং বদলে গেল রুচি।

ধর্মঘটের ডাকটি দিয়ে মিছিল যখন করে
সেই মিছিলে গুলি তখন চালায় যে বর্বরে।
গুলির ঘায়ে রক্ত ঝরে, হয় রাজপথ লাল
কিন্তু তবু দাবির মিছিল চলল বেসামাল।

আঠারোশো ছিয়াশিতে এই ঘটনাই ঘটে
কারখানা সব বন্ধ থাকে উদ্ভূত সংকটে।
বাধ্য হয়ে মালিকশ্রেণি মানলো যত দাবি
শ্রমিক পেল আট ঘণ্টা কর্ম করার চাবি।

এই ঘটনা আমেরিকার শহর শিকাগোতে
ঘটেছিল বলেই শ্রমিক জিতল শেষে ওতে
সেদিন থেকে পহেলা মে শ্রমিক দিবস হয়
মে দিবসের সব কাহিনি বুঝেছো নিশ্চয়!

মে দিবসের পদ্য

আবুল হোসেন আজাদ

ছিল ওরা নির্যাতিত মিল-কলকারখানায়
হাড়ভাঙা সব পরিশ্রমে দিনটা চলে যায়।
কপালের ঘাম পায়ে ফেলেও পায় না বস্ত্র অন্ন
শ্রমিক ওরা কলুর বলদ গতর খাটা পণ্য।
প্রতিদিনে আট ঘণ্টা চাই কাজের অধিকার
এই দাবিতে মিছিল নিয়ে পথে একাকার।
আমেরিকার শিকাগোতে পহেলা মে-তে
ন্যায্য দাবির জন্য নামে ওরা স্লোগানেতে।
ওদের মিছিল রুখতে যেয়ে পুলিশ করে গুলি
সেই গুলিতে প্রাণ হারালো উড়লো মাথার খুলি।
সেই থেকে যে শুরু হলো মে দিবসটা পালন
বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ করে লালন।
ওরা পেল আট ঘণ্টার এই কাজের অধিকার
সুস্থ সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও বাঁচার।
কিন্তু তবু পায় না আহার হয় না আইন মানা
বিশ্বজুড়ে চলছে এমন যদিও সবার জানা।

আস্থা

নাহার আহমেদ

এমন একটা পদ্মপাতা
কখনো যদি পেতাম
বিশ্বাসী মন সঁপে দিতাম
নিঃসংকোচে তারে।
জলের মতো আপন করে
স্বপ্নগুলো রাখতো ধরে
যেত না ওরা কখনো আর,
ওমন করে হারিয়ে আমার
জীবন থেকে সরে।
ফাগুন কেন বোঝে না যে
আমার মনের কথা,
কষ্টগুলো উসকে দিতে
কড়া নাড়ে কেন এসে
আমার দরজাটাতে।
যৌবনের ঐ পালকিটাতে
একলা রেখে সেদিন
চুপিসারে পালিয়েছিল
রিক্ত করে গিয়েছিল
ছিলাম সঙ্গীবিহীন।
ফেরারি সুখ খুঁজে পেতে
এ কোন মোহের জোনাক এসে
উঁকি দিয়ে জানালাতে
হাতছানি দেয় ডাকে।
নির্লজ্জতার পর্দা খুলে
অস্থিরতার দেয়াল ভেঙে
তিয়াসি মন ছুটলো তখন
ফিরে পেতে তারে।

মানবতার মা

বাবুল তালুকদার

দাঁড়িয়ে আছে বাংলার বুকে
সূর্যসন্তানের পাশে থাকে প্রতিমুহূর্ত
মানবতার হাত বাড়িয়ে দেয়
মুহূর্তেই কষ্ট আর বেদনা ভুলে যায় মানুষ।
কালো মুখোশ পরা মানুষগুলো চোখে দেখে না
যা ইচ্ছে তাই বলে যায়
কালো মুখোশ খুলে ফেল মুখ থেকে
তবেই সবকিছু দেখতে পাইবে পরিষ্কার।
মানবাধিকার, সুখ-শান্তি-ভালোবাসা, উন্নয়নের আলো
বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দেয় মানবতার মা।
তবু হানাহানি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব বাংলার বুকে ছড়িয়ে তবে কেন
শান্তির পায়রাগুলো শান্তিতে থাক
অশান্তি করো না আর এই বাংলায়
মুখ থেকে কালো মুখোশ সরিয়ে নাও
তবেই, সবকিছু দেখবে
শান্তিপ্রিয় দেশ, অশান্তি করো না
সভ্য ও সুশীল সমাজের মাঝে নোংরামি করো না সাবধান।

নারী

মোহাম্মদ আহছানউল্লাহ্

আজও এমন অনেক নারীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ মেলে
যেমন মহীয়সী নারী শেখ হাসিনা
যাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে জাগরণের বহ্নিশিখা
সদ্য পরিস্ফুটিত গোলাপের মতো
পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে।
নারী আজ আর হিমপ্রবাহে লুকায়িত হিরের টুকরো নয়
নয় সুপ্ত আগ্নেয়গিরির লাভার মতো
শিশির সিক্ত বকুলের ঝরা পাপড়িও নয়
উজ্জ্বল নক্ষত্র খচিত তারা ভরা আকাশ
দিগন্ত ছুঁয়ে উপচে পড়া অশান্ত ঢেউ
শক্ত পেশির একচ্ছত্র অধিকার বুকে দুর্বার হিম্মত
আশার নীহারিকা ভরসার প্রদীপ্ত সূর্য
জ্যোতির্ময় পৃথিবী কালের অবগাহন
নতুনের অভিলাষ সভ্যতার আলোকবর্ষ।
সুখের অবলীলা প্রকৃতির মহোৎসব
বিশ্বের রূপান্তর জাতির গর্ব
পুরুষের আত্ম-দাম্ভিকতা সন্তানের জীবন।

স্বপ্নদর্শী শেখ হাসিনার জয়

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

স্বপ্নদর্শী শেখ হাসিনা স্বপ্নে দেখেন জয়
আল্লাহই মানতে করেন না শত্রুর ভয়।
স্বপ্নে তিনি দেখেন যা
বাস্তবেতে করেন তা
কথা কাজের মাঝে না-ব্যবধানটা রয়
দেশের জন্য স্বপ্ন দেখেন নিজের জন্য নয়।
তাই ডিজিটাল দেশের জন্য
স্বপ্ন দেখেন এক অনন্য
বাঙালিদের করাতে গণ্য সারা বিশ্বময়
শক্তি দিয়ে সাহস দিয়ে করছেন তাই নির্ভয়।
সৎ চিন্তা সৎ ধ্যানে
মানবতার মহাজ্ঞানে
যেখানেই যান জয়কে পান শক্তি না করে ক্ষয়
সমুদ্র জয়ের পরেই করলেন আকাশটারেও জয়
দোয়া মাঙ্গি তাঁর যেন জয় অব্যাহত রয়।

মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা

জিশান মাহমুদ

লাল-সবুজের এই দেশেতে
ফুটে হাজার ফুল
কারো সাথে শেখ হাসিনার
নাই যে কোনো তুল।
গরিব-দুখির জন্য সদা
কাঁদে তোমার মন
কেমনে তাদের ভালো হবে
ভাবো সারাক্ষণ।
হাজার হাজার গরিব-দুখির
মুখে ফুটাও হাসি
মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা
তোমায় ভালোবাসি।

কান্নাটা হাসি হয়

ওয়াসীম হক

পতঙ্গ জেনেছিল ফুল ফোটা ফাগুনে
ছাই হবে ঝাঁপ দিলে গনগনে আগুনে
আমরাও জানি তবু না জানার ভাব নেই
হেমলক পান ছাড়া বেঁচে থেকে লাভ নেই।

যুগটাই এরকম শুধু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
মমতার কোলজুড়ে মেকি এক গন্ধ
আয়নার স্বচ্ছতা দিনে দিনে কমছে
পরতে পরতে বুঝি ধুলোবালি জমছে।

নেই মেঘমল্লার তানসেন হারালো
দরজায় ছায়া হয়ে দুখ বুঝি বাড়ালো
বাগানের ফুল ঝরে ঘ্রাণটুকু বাসি হয়
ফরমালিনের তেজে কান্নাটা হাসি হয়।

চাঁদকে দেখা

গোলাম নবী পান্না

চাঁদকে দেখে ঈদের খুশির লাগলো ঢেউ,
আড়মোড়া ভাব সরিয়ে তাই জাগলো কেউ।

ভাবটা এমন চাঁদকে আগে ধরতে হবে,
নাগাল পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে লড়তে হবে।

তবেই না হয় সফল হবে চাঁদকে দেখা,
ঢেউ ডিঙিয়ে যেমনিভাবে বাঁধকে দেখা।

মনটা কি আর বসতে পারে পাঠের পাশে?
দৌড়ে ছোটা অমনি তখন মাঠের পাশে।

চাঁদের মাঝে ঈদের খুশির রেশ কি তবে?
চাঁদকে দেখার আনন্দ আর শেষ কি হবে!

খোকার ঈদ

বশিরুজ্জামান বশির

আমার খোকার সাহস বেশি
কাউকে দেয় না ফাঁকি
খোকার মতো স্বপ্নগুলো
কেমন করে আঁকি?

ঈদের চাঁদ খোকার মনে
স্বপ্ন মেলে ডানা
ঈদের দিন অসৎ পথে
গড়তে জীবন মানা।

খোকার মতো ঈদের ছবি
কেউ পারে না আঁকতে
সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়
কেউ পারে না ঢাকতে।

ঈদ মানে ভালোবাসা

অপু বড়ুয়া

ঈদ দেয় জীবনের দ্বিধা ঘুচিয়ে
ঈদ আসে শান্তির পসরা নিয়ে
হিংসা ও হিংস্রতা
হৃদয়ের জটিলতা
মন থেকে সব দোষ দেয় মুছিয়ে।

ধনীদের মনে দেয় মমতার রেশ
গরিবের মাঝে থাকে সুখের আবেশ
থাকে না তফাৎ কোনো গরিব-ধনীর
এক হয়ে যায় সব হৃদয়ের তীর।

ঈদ এসে বলে যায় সবাই সমান
মানুষের মাঝে কোনো নেই ব্যবধান
কদিনের দুনিয়ায়
কেউ আসে কেউ যায়
প্রাণে প্রাণে গড়ি এসো ফুলের বাগান।

মা আছে তাই

শিল্পী ভদ্র

মা আছে তাই ভরে আছে জগৎ, জীবন, মন।
এমন করে স্নেহের ছায়ে,
ভালোবাসার প্রাণে প্রাণে,
এমন করে মধু-মায়ায়,
যে জন সুধায় মিষ্টি কথায়–
তার মনেরই চাওয়া।
সে চাওয়াতো একটি কথা– ভালো আছি কি-না।
ভালো আছি, ভালো থাকি,
সে চাওয়াতে মমতাময়ী,
উদাস হয়ে বারে বারে ভাবনা-বিভোরী।
মাগো, তুমি এমন কেন!
গড়ন– তোমার এমন করে–
সন্তানের সুখ কীসে হয়, এ-ই জীবনব্রত!
সবাই খোঁজে পাওনা-দেনা,
মা ঢাকে, ছড়িয়ে স্নেহচ্ছায়া।
আপদ-বালাই আড়াল করে,
জাদু তার থাকবে সুখে,
এছাড়া আর বড়ো চাওয়া, অভিধানে নাই।
ঝড়ের ঝাপটা তুমি সয়ে,
লুকিয়ে রাখো বুকের মাঝে।
নিজের টুকু বিলিয়ে দিয়েও চাও–
আমরা যেন থাকি সুখে।
এমন কেন তুমি!
আনমূল কোন উপাদানে গড়েছে তোমায় বিধি!
মা-দেখে, জীবনের সীমানাটা;
কষ্টগুলো বয়ে, সয়ে,
বাছার জীবনদীপ উজ্জ্বল যাতে
সেই ভাবনার-তরী, বেয়ে চলে সে একা।
না বুঝিয়ে পথের ব্যথা,
ধরে রাখে গতিধারা।
মাগো তোমরা এমন কেন!
ধনী, অধনী, রুগ্ন, সফল–
সবার প্রাণে একটিই চাওয়া–
সুখে থাক, সন্তানেরা।

মন ময়ূরী

মনির জামান

মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ যখন তোমায় মনে পড়ে
একটি কুসুম দ্বিধায় ভীষণ বুকের ভেতর নড়ে।

শিশিরে রং ছড়ায় যেমন অগ্নিমুখর রবি
ভোরবেলার-ই স্বপ্নের মতন জ্বলজ্বলে সেই ছবি।

চোখ খুললেই ব্যথায় ভরে চোখের পাতা দুটি
তবুও বাঁচি গোপন সুখে মন ময়ূরী জুটি।

ভুল সময়ে জন্ম নেয়া; (তোমার আমার) ভুল সময়ে দেখা
বলবে তুমি আমায় ছাড়া কেমনে থাকো একা?

সন্ধ্যা

রোকসানা গুলশান

সন্ধে হলো, একে একে
জ্বললো সকল বাতি,
পোড়ালো কেউ ধূপের ধোঁয়া
কেউ বা আগরবাতি।

শুয়ে থাকা কুকুরগুলো
একটু ইতস্তত।
আমি ছুটি ঘরের মুখে
একলা পাখির মতো।

ধীর বায়ুতে যাচ্ছে তরী
ছলাত সুরের তালে
নদীজলে পড়লে আলো
সোনা ছড়ায় পালে।

যাত্রী নামে শান্ত পায়ে
পাটুরিয়া ঘাটে,
কেউ আসে কেউ যায় গো ছুটে
নিজেরই তল্লাটে।

মায়ের, বোনের, ভাইয়ের কাছে
নিজেরই সংসারে,
উড়াল পাখি ডানা গুটায়
ছোট্ট নিজের ঘরে।

দূরের তারা থাকুক দূরে
স্বপ্নকে সাজাতে,
জাগতে যেন পারি আমি
রঙিন সুপ্রভাতে।

ধৈর্য, সাহস, কৃতজ্ঞতায়
দিয়ে যত শ্রম
এই জীবনের সন্ধ্যা-সকাল
করি অতিক্রম।

নীল আকাশে গায়

সন্তোষ রায়

ডাক দিয়ে যায় রঙিন ফানুস
নীল আকাশে গায়
আয় ছুটে আয় দেখবি তোরা
হাতির ঝিলে আয়।

রঙিন ফানুস দেখছে মানুষ
উড়ছে আকাশ পানে
সুতা নাটাই ছাড়া ফানুস
আলোর ঝলক আনে।

ঈদের মজা আকাশ জোড়া
জানান দিয়ে আসে
সুতা নাটাই ছাড়া ফানুস
নীল আকাশে ভাসে।

সব দিয়েছ মা

আহসানুল হক

মাগো তুমি সব দিয়েছ
দাওনি কী তা বলো ?
তোমার কোলে ঠাঁই দিয়েছ
আলো-বাতাস-জলও !

শস্য-সবুজ-শ্যামলিমা
মিষ্টি সুবাস ফলও
তুমি দিলে স্নেহের পরশ
বীরের সাহস-বলও !

তোমার কোলে জন্মে যে মা
জন্ম ধন্য হলো
মাগো তুমি সব দিয়েছ
দাওনি কী তা বলো ?

তোমার ছবি দৃষ্টি জুড়ায়
জুড়ায় অবিরত
এক নিমিষে দেয় ভুলিয়ে
দুখ-বেদনা-ক্ষত !

তোমার দানের হয় না তো তুল
তুমি উদার কতো
কোথায় পাব এমন মায়া
ঠিক তোমারই মতো !

তোমার স্মৃতি যায় না ভোলা
থাকি দূরেই যত
তোমার প্রতি ধূলিকণায়
প্রণাম জানাই শত !

আত্মবিশ্বাস

জাওয়াদুল ইসলাম ভুঁইয়া

ঝিনুকের মাঝে মুক্তা জ্বলে
কে দেখে তার শোভা
আড়ালে থাকলে কে দেখে তোর
লুকায়িত যত প্রভা ?

আড়ালে থাকলে কে তোকে হায়
করবে পুষ্পবরণ
পিছু হটে গেলে কে দেবে তোরে
সঠিক মূল্যায়ন।

সমুখের পানে এগিয়ে চলতে
কেন এত সংশয়
আপনাকে কেন তুলিয়া ধরতে
জেগে ওঠে মনে ভয়।

কীসের লজ্জা! কীসের হতাশা!
কেন লুকোচুরি খেলা
আপনাকে কেন তুচ্ছ ভেবে
করে যাও অবহেলা।

আপন প্রতিভা করবো প্রকাশ
দিই মোরে আশ্বাস
আপনারে আমি করবো বিকাশ
বুকে থাক বিশ্বাস।

মন খারাপের দিনে

কামাল হোসাইন

আমার মন খারাপের দিনে
তুমি থাকো যে দূর দেশে
আমায় না দিয়ে সান্ত্বনা
তুমি বেড়াও হেসে হেসে...

তুমি এমন কেন মেয়ে...
দারুণ খুশি হয়েছিলাম
তোমায় কাছে পেয়ে

তুমি কেবল থাকো দূরে
ডাকি তোমায় মায়ার সুরে
তুমি সুর কেটে দাও তাল থামিয়ে
বেড়াও ঘুরে ঘুরে...

আমার মন খারাপের দিনে
তোমায় পাই না ছোঁয়া মোটে
আমি হায় কতদিন দেখি না ওই
মিষ্টি হাসি ঠোঁটে।

আমি একলাটি আজ বসে
কেবল তোমার কথাই ভাবি
আমি জানি জানি তোমার কাছেই
মন হারানোর চাবি।

দাবি ফিরে এসো আবার
তোমার নেই তো কোথাও যাবার
তুমি ফিরে আসো যদি
উধাও মন খারাপের নদী।

সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি

আজহার মাহমুদ

মাগো আমি যুদ্ধে যাবো
দাও না দোয়া করে,
ফিরবো মাগো পতাকা নিয়ে
যদি না যাই মরে।

বাংলা মাকে স্বাধীন করে
আসবো তোমার বুকে,
'খালা তুমি থেকো পাশে
আমার মায়ের দুঃখে।'

যুদ্ধে গিয়ে যদি মাগো
ফিরে আর না আসি,
যদি আমি ধরা পড়ে যাই
দেয় ওরা ফাঁসি।
তবুও মাগো আমার মুখে
থাকবে সুখের হাসি।
বলবো আমি চিৎকার করে,
সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি।

শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মহান মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার স্মৃতি শ্রমজীবী মানুষ তথা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে চির অম্লান হয়ে থাকবে। ১লা মে 'মহান মে দিবস' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। 'শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মহান মে দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

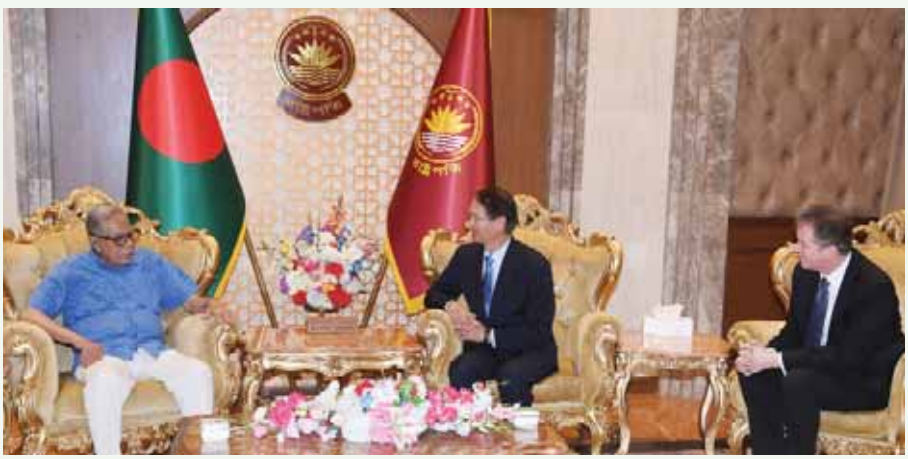

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ১০ই মে ২০২২ বঙ্গভবনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ভিনসেন্ট চ্যাং ও রেজিস্ট্রার ড. ডেভিট ডাউল্যান্ড সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বাধীনতার পর মে দিবস রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় এবং জাতির পিতা মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে মজুরি কমিশন গঠন করেন এবং তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতার উদ্যোগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে এবং আইএলও-এর ছয়টি কোর কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতসহ কৃষক ও শ্রমিককে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত সকল আইনের সমন্বয় করে ২০০৬ সালে প্রণীত হয় 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' যা ২০১৩ ও ২০১৮ সালে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২০১৫ সালে প্রণয়ন করা হয় 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫'। এছাড়া 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩' এবং গৃহশ্রমিকের সুরক্ষায় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক-মালিক উভয়ের সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হতে হবে।

ঈদুল ফিতর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ঈদুল ফিতর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর অপার খুশি আর আনন্দের বারতা নিয়ে আমাদের মাঝে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। এ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, গ্রামগঞ্জে, সারা বাংলায়, সারা বিশ্বে। এদিন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক কাতারে শামিল হন এবং ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেন। ঈদ সবার মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর ঐক্যের বন্ধন। ৩রা মে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এখানে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, কূপমণ্ডূকতার কোনো স্থান নেই। মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহাবস্থান, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাম্যসহ বিশ্বজনীন কল্যাণকে ইসলাম ধারণ করে। ইসলামের এই সুমহান বারতা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, মানবতার মুক্তির দিশারি হিসেবে ইসলামের মর্মার্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, বিশ্ব ভরে উঠুক শান্তি আর সৌহার্দ্যে– পবিত্র ঈদুল ফিতরে এ আমার প্রত্যাশা।

চিকিৎসা সেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, চিকিৎসা সেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও প্রগতিশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে সরকার সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করছে। ২৬শে এপ্রিল কমিউনিটি ক্লিনিকের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার ও সুসংহত করার লক্ষ্যে সরকার 'কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১৮' প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় দেশব্যাপী ১৪,১৫৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১৪,১২৭টি ক্লিনিকে সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের অন্যতম 'কমিউনিটি ক্লিনিক' কার্যক্রম আজ জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন, জীবনমান বৃদ্ধি ও সার্বিক জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। করোনা মহামারি মোকাবিলায়

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, সামাজিক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং গণটিকা কর্মসূচির মাধ্যমে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রমে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রশংসনীয় অবদান রাখছে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা যথাযথ ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার করতে সরকার, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

অটিজম শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটিজম আক্রান্ত শিশুরা যেন সমাজের মূলধারায় আর দশজন মানুষের মতো নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ শিশুদের লুকায়িত সুপ্ত প্রতিভা বের করে আনতে হবে। প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী অটিস্টিকদের কল্যাণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অটিস্টিক শিশুরা আলাদা কোনো ব্যক্তি নয়, তাদের আপন করে নিতে হবে এবং তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। তারা যেন নিজেদের বাবা-মার বোঝা মনে না করে। এছাড়া ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে অটিস্টিক শিশুদের স্থায়ী আবাসন ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে সরকার উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

পানিসম্পদ অপচয় রোধ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা এপ্রিল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গ্রিন রোডের পানি ভবনে 'বিশ্ব পানি দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানির অপর নাম জীবন। তাই পানিসম্পদ রক্ষা করা আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। পানি ব্যবহারে সবাইকে সচেতন থাকার এবং অপচয় রোধ করার আহ্বান জানান তিনি। এ অমূল্য সম্পদ আমরা কীভাবে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে পারি এবং ভবিষ্যৎ বংশধর ব্যবহার করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

একনেক সভায় ১২ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি শেরেবাংলা নগরের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ১২ হাজার ১৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ১২ প্রকল্পের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার সময় কক্সবাজারে সাগরতলে ফিশ অ্যাকুরিয়াম নির্মাণের নির্দেশ দেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই এপ্রিল গণভবনে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি যেমন আমাদের জন্য সুযোগ তৈরি করে, তেমনি এটি আবার সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তার বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ব্যাংকে জমা হওয়া টাকা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই সর্তক থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গবেষণার দরকার। তাছাড়া বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণসমাজকে আরও বেশি উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও তাদের মনমানসিকতাকে গড়ে তোলার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

পুলিশকে সততার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই এপ্রিল পুলিশের দুটি উদ্যোগ দেশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীন মানুষের জন্য পুলিশের আবাসন প্রকল্প উদ্‌বোধন করেন। গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন তিনি। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে এপ্রিল ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিটাক, বিসিক ও বিএসইসি কর্তৃক সমাপ্ত চারটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর শিল্পদর্শন ও শিল্পায়নে উত্তরণ' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

পুলিশের এ উদ্যোগ গ্রহণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা তৃণমূল থেকে উন্নয়ন শুরু করেছি। সর্বস্তরের মানুষ যেন উন্নয়নে ছোঁয়া পায় আর কেউ যেন ভূমিহীন ও গৃহহীন না থাকে– সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশকে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ লক্ষ্যে তিনি পুলিশকে সেবক হওয়ার এবং সততার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

নবনির্মিত ৪০টি ফায়ার স্টেশনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে এপ্রিল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ভবনে অনুষ্ঠিত নবনির্মিত ৪০টি ফায়ার স্টেশনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শিল্পকারখানাসহ প্রতিটি ভবনে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। জলাধার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার এবং দুর্গত এলাকায় যেন দমকলবাহিনীর গাড়ি পৌঁছাতে পারে, সেজন্য রাস্তার প্রশস্ততার পাশাপাশি পানির সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সংস্থাটির সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া অগ্নিকাণ্ড যাতে না ঘটে সেজন্য দেশের জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে এপ্রিল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে তৃতীয় পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়েছে ৩২ হাজার ৯০৪টি গৃহ ও ভূমিহীন পরিবার। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে বাড়ির দলিল ও চাবি পেয়ে সবাই আবেগাপ্লুত ও আনন্দে আত্মহারা। একযোগে দেশের ৪৯২টি উপজেলাকে যুক্ত করা হয় ভিডিও কনফারেন্সে। এছাড়া ৪টি জেলার চারটি স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুবিধাভোগী ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান

দেশের সাফল্য তুলে ধরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে জাতিকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১৮ই এপ্রিল রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে চট্টগ্রাম বিভাগ সাংবাদিক ফোরাম, ঢাকা (চবিসাফ) আয়োজিত ইফতার ও আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের তুলনায় বাংলাদেশে ২০২১ সালে দারিদ্র্য শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে। দারিদ্র্য যেখানে আগে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল সেটি এখন ১১ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং করোনা মোকাবিলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাংক এত যাচাইবাছাই করে রিপোর্ট করে, তারপরও তারা যে আমাদের প্রশংসা করেছে, বিশ্বের অস্থিরতার মধ্যেও বাংলাদেশ যে অকল্পনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে এবং ক্রমাগতভাবে দারিদ্র্য হার কমছে–এ বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ জানাই। কারণ সাফল্যের চিত্র আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায় আর স্বপ্নহীন মানুষ যেমন এগুতে পারে না, স্বপ্নহীন জাতিও এগুতে পারে না। সরকারের সমালোচনা থাকবে, কিন্তু পাশাপাশি জাতিকে এগিয়ে নিতে সাফল্যের চিত্রও তুলে ধরতে হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের বিবেক। সাংবাদিকরা তাদের লেখনীর মধ্যে দিয়ে সমাজকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দিতে পারে, দায়িত্বশীলদেরকে আরও দায়িত্ববান করতে পারে। আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গঠনেও সাংবাদিকরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় মুজিবনগর সরকারের অধীনে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন বিধায় তিনি শপথ নিতে পারেননি, তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত সরকার ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন কুষ্টিয়ার মুজিবনগরে শপথ নিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম সরকার এই মুজিবনগর সরকারের অধীনেই পুরো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। এই সরকারের অধীনেই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ১৭ই এপ্রিল সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত *সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেনের

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৭ই এপ্রিল ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সম্পাদিত 'সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

সভাপতিত্বে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া সভায় অংশ নেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় মুজিবনগর দিবসে সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, এদিন শপথ গ্রহণে যাবার জন্য মুজিবনগর সরকারের সদস্যরা এবং সংবাদ সংগ্রহের জন্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা সবাই মধ্যরাতে কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে যাত্রা শুরু করেছিল গন্তব্য না জেনেই। পরে সবাই কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে সমবেত হন, পরে সেই জায়গার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। যে সাংবাদিকরা সেদিনকার এই সংবাদ সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোড়ক উন্মোচিত গ্রন্থ বিষয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ১৯৫২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে সংবাদগুলো পরিবেশিত হয়েছিল, সেগুলো এই বইতে স্থান পেয়েছে। এমন তথ্য সংবলিত দুর্লভ চিত্র এখানে আছে যা দেখলে পুরো বইটি পড়তে ইচ্ছে হয়। তিনি আরও বলেন, তখনকার *দৈনিক আজাদ*, *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক বাংলা*, *পূর্বদেশ*, *পিপলস*, *মর্নিং স্টার*, *অবজারভার*, বিদেশি পত্রিকার *মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা*, *হিন্দু*, *ইভিনিং নিউজ*, *নিউইয়র্ক টাইমস*, *টাইমস*, *জাপান টাইমস*, *গার্ডিয়ান*, *ওয়াশিংটন পোস্ট*সহ নানা পত্রিকার অংশ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

সচিব মো. মকবুল হোসেন বলেন, ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস জাতির এক উজ্জ্বল স্মরণীয় দিন। এই দিনের ওপর আলোচনা আমাদের মাঝে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অনুভবকে শানিত করে। একইসাথে সচিব *সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থটি সকলকে পড়ে দেখার আহ্বান জানান। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর সম্পাদিত ও প্রকাশিত ৪৯৬ পৃষ্ঠার ৫০০ টাকা মূল্যের *সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু* গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রায় পাঁচ শতাধিক দেশি-বিদেশি সংবাদ শিরোনামের ছবি ও তথ্য রয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী রক্তের অক্ষরে লেখা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি ও মৈত্রী রক্তের অক্ষরে লেখা এবং এ মৈত্রী অবিচ্ছেদ্য। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে ভারতের অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১২ই এপ্রিল রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদ আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও ভারতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে ভারতের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া কখনো আমাদের পক্ষে নয় মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভবপর হতো না। একাত্তর সালে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ভারত পরবর্তীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণার পর ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাথে একযোগে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ভারতের সেনাবাহিনীর শত শত সদস্য আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শহিদ হয়েছে। তাই ভারতের সাথে আমাদের যে মৈত্রী, আমাদের যে সম্পর্ক, সেটি রক্তের অক্ষরে লেখা। শুধু তাই নয়, যখন পাকিস্তানের কারাগারে থাকা বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায় ঘোষণা হয়, তখন তৎকালীন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠিত করার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। সেজন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞতাভরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানকে স্মরণ করি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

১৯৭১ সালে ভারতের মানুষ বাংলাদেশিদের জন্য তাদের আঙ্গিনার দুয়ার যেভাবে খুলে দিয়েছিল তেমনি তাদের হৃদয়ের দুয়ারও খুলে দিয়েছিল উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এক কোটি মানুষ ভারতের যে বিভিন্ন পরিবারের সাথে আশ্রিত ছিল, তারা তাদেরকে বোঝা মনে করেনি, পরম আপন ভেবে আশ্রয় দিয়েছিল। ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড় সবাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। কলকাতা, আগরতলা, দিল্লিসহ বিভিন্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায় তারা আমাদের শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাই ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী চিরঅম্লান এবং এই মৈত্রী রক্তের অক্ষরে লেখা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, আজকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এবং ভারতের নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী একটি নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আমাদের দুর্যোগ, দুর্বিপাকে ভারত আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, আমরাও সামর্থ্য অনুযায়ী ভারতের প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি– এভাবেই বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করার মধ্যেই এ অঞ্চলের উন্নয়ন নিহিত উল্লেখ করে বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদ দুদেশের মধ্যে আরও বেশি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও দুদেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

এফবিসিসিআই ও ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের চুক্তি সই

বাংলাদেশের ভিশন-২০৪১ অর্জনসহ দুই দেশের সহযোগিতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা খুবই আশাবাদী। ঢাকা সফররত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ৯ই মে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এফবিসিসিআই ও ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। অনুষ্ঠানে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে এফবিসিসিআই ও ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ চলছে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেন। অনুষ্ঠানের মুক্ত আলোচনায় উপস্থিতগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

প্রবাস আয়ে বিশ্বে সপ্তম বাংলাদেশ

প্রবাস আয় প্রাপ্তিতে ২০২১ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে সপ্তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। গত বছর দেশে প্রবাস আয় এসেছে ২ হাজার ২২০ কোটি ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবাস আয় বেড়েছে ২.২ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে। ১০ই মে প্রকাশিত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর প্রবাস আয় নিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করে বিশ্বব্যাংক ও গ্লোবাল নলেজ পার্টনারশিপ অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (নোমাড)। ২০২০ সালেও প্রবাস আয়ে সপ্তম স্থানে ছিল বাংলাদেশ। সে বছর প্রবাস আয় ছিল ২ হাজার ১৭০ কোটি ডলার। চলতি বছরের শেষ নাগাদ প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধির হার ২ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। ২০২১ সালে প্রবাস আয়ে প্রথম রয়েছে ভারত। এরপর রয়েছে– মেক্সিকো, চীন, ফিলিপাইন, মিশর ও পাকিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত ও পাকিস্তানের পরই।

স্পেন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত করতে চায় স্পেন। বাংলাদেশ-স্পেন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১২ই মে ঢাকায় একটি হোটেলে স্পেন দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্পেনের রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিকো ডি আস-এসবেন-তেজ সালাস একথা জানান। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত বলেন, ৫০ বছর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পরপরই অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর দেশ ও জনগণকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র ৫০ বছরে বাংলাদেশের 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় মিরাকল'-এর স্বীকৃতি দেয় স্পেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত বলেন, স্প্যানিশ রাজা বাংলাদেশ- স্পেন সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এনভয় গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবুদ্দীন আহমেদকে 'অফিসার্স ক্রস অব দ্য রয়াল অর্ডার অব দ্য সিভিল মেরিট' প্রদান করেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

বিদেশি ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বেড়েছে

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বেড়েছে বাংলাদেশের। সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত সর্বশেষ হালনাগাদ করা প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই ২০২১–মার্চ ২০২২) ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ পরিশোধ করেছে এক হাজার ৫৯৫ মিলিয়ন ডলার। প্রতি ডলার ৮৬ টাকা দরে হয় ১৩ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে একই সময় এর পরিমাণ ছিল এক হাজার ৪৪৭ মিলিয়ন ডলার বা ১২ হাজার ২৫৫ কোটি টাকা। সার্বিক বিবেচনায় গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময় ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে এক হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। ৯ই মে প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যম থেকে এ তথ্য জানা যায়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ অনেক ভালো অবস্থানে আছে। শ্রীলঙ্কার মতো কোনো পরিস্থিতি হওয়ার আশঙ্কা এখন নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতি একমুখী নয়। আমাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাও বেশি। তাই শ্রীলঙ্কার মতো কোনো পরিস্থিতি হওয়ার সুযোগ নেই।

ইআরডির প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে ঋণের অর্থের মধ্যে সুদ পরিশোধ করেছে ৪১১ কোটি ৬৫ মিলিয়ন ডলার এবং মূল ঋণ পরিশোধ ৯৮৬ মিলিয়ন ডলার। তবে গত অর্থবছর একই সময় বাংলাদেশ পরিশোধ করেছিল সুদ ৪০৫ মিলিয়ন ডলার আর আসল এক হাজার ৪১ ডলার। একই সময় অনুদান এসেছে ১৮০ মিলিয়ন ডলার এবং ঋণ হিসেবে এসেছে ছয় হাজার ৬১৬ মিলিয়ন ডলার। এর আগে গত অর্থবছরের একই সময় অনুদান এসেছিল ১৪৭ মিলিয়ন ডলার এবং ঋণের অর্থ এসেছিল চার হাজার ২৩৩ মিলিয়ন ডলার।

দেশে তৈরি অত্যাধুনিক ১০ নৌযান কোস্টগার্ড

উপকূলীয় এলাকায় নিয়মিত টহল প্রদান, মাদক চোরাচালানবিরোধী অভিযান ও সমুদ্রগামী জাহাজে দুর্ঘটনা-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১১ই মে খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি টাগ বোট, ছয়টি হাইস্পিড বোট, একটি ফ্লোটিং ক্রেন, নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে নির্মিত একটি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল কোস্টগার্ডকে হস্তান্তর করা হয়। এর ফলে কোস্টগার্ডের ফায়ার ফাইটিংসহ সাড়ে ৩ হাজার টন ওজনের জাহাজে বার্থিং/আন-বার্থিং (ছোটো জায়গায় মুভমেন্টে সহযোগিতা), জাহাজের দুর্ঘটনাকালীন সহযোগিতা, ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার, অনুসন্ধানসহ অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের বাণিজ্যের নব্বই শতাংশই সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র সম্পদের ভাণ্ডার আমাদের অধিকারে এসেছে। এগুলো আহরণ ও সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপত্তায় কোস্টগার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। অত্যাধুনিক ফ্লোটিং ক্রেন, টাগ বোট, হাইস্পিড বোট, ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেলের মাধ্যমে কোস্টগার্ড এখন সত্যিকার অর্থে 'গার্ডিয়ান অব সি' পরিচিতি পেয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার

ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্য নিয়ে জয়পুরহাটে হচ্ছে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার'। দুই বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু হবে এবং প্রতিবছর এক হাজার তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। প্রতিমন্ত্রী ৯ই এপ্রিল জয়পুরহাটের কালাই-এ সরকারি মহিলা কলেজে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বলেন, দেশে ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধি করতে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরি করবে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২৯শে এপ্রিল ২০২২ ভারতের আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ারে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ আইটি বিজনেস সামিট ২০২২'-এ সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ জানান, জয়পুরহাট ছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় আরও ১০ জেলা– মানিকগঞ্জ, ভোলা, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, বান্দরবান, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, দিনাজপুর ও মেহেরপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১১টি জেলায় প্রায় ৭৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

সাইবার নিরাপত্তায় নেতৃত্ব দিতে কাজ করছে বাংলাদেশ

সরকার, একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে সাইবার টুলস ও সাইবার সল্যুশনে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে বাংলাদেশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টার নির্দেশনায় সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিকস ও মাইক্রো প্রসেসিং ডিজাইন– এ চারটি ডোমেইনে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে আইসিটি বিভাগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানান তিনি। ১০ই এপ্রিল মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) আইসিটি বিভাগের 'নিরাপদ ইমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রথম 'সাইবার রেঞ্জ ল্যাব'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সাইবার স্পেস, রাষ্ট্রীয় ডিজিটাল কাঠামো, সামরিক-বেসামরিক, সরকারি-বেসরকারি, আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এমআইএসটিতে সব সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সাইবার রেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ভার্চুয়াল বিজনেস প্রেজেন্স প্ল্যাটফর্ম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশে ব্যাবসা করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেটা ভার্সন কিংবা ভার্চুয়াল বিজনেস প্রেজেন্স প্ল্যাটফর্ম প্রবর্তন করা হচ্ছে। ১০ই মে নিউইয়র্কের ট্রাম্প ভবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ আইটি ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এ তিনি বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষেই সরাসরি গিয়ে ব্যাবসা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। সে কারণে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে না গিয়ে বিদেশ থেকেই সেখানে ব্যাবসা বা বিনিয়োগ করতে পারবেন। এরই মধ্যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ অর্জন করেছি। আইসিটি সেক্টরে গত ১৩ বছরে ২০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৯০ শতাংশ নাগরিক ই-সার্ভিসের আওতায় এসেছে।

দেশে স্টার্টআপ বাড়ছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নানা উদ্যোগের ফলে ২০১০ সাল থেকে দেশের আইসিটি খাতে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ১০ শতাংশ করে বাড়ছে। এসময়ের মধ্যে দেশে আড়াই হাজারের বেশি স্টার্টআপ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই ডিজিটাল সেবাভিত্তিক ব্যাবসা করছে। স্টার্টআপে বিনিয়োগ প্রায় সাড়ে ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আইটি বা আইটিইএস খাতে ২০ লাখের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল কর্মীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানিতে শীর্ষদেশে পরিণত হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক নির্দেশনায় ২০২৫ সালের মধ্যে আইটি সেক্টরে ৩০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শতভাগ ই-সার্ভিস প্রদান, ২০৩১ সালের মধ্যে ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক, অগ্রসরমান অর্থনীতি, উদ্ভাবনী ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা এবং মাথাপিছু ১২ হাজার মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে দেড় গুণ

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের সুদিন যাচ্ছে। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) দেশটিতে ১৪৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১২ হাজার ৩৮৭ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ১০০ কোটি ডলারের পোশাক। সেই হিসাবে এবার রপ্তানি বেড়েছে দেড় গুণের মতো।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ তৃতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই বাজারে গত বছর বাংলাদেশ ৭১৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২০ সালের চেয়ে এই আয় ছিল প্রায় ৩৭ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের প্রথম মাসে সেই প্রবৃদ্ধিকেও টপকে গেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মাস শেষেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। সব মিলিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

আম রপ্তানি বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ

দেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, মেহেরপুর, সাতক্ষীরাসহ পার্বত্য জেলায় এখন বেশ মানসম্মত আম উৎপাদন হয়। রাজধানী ঢাকা থেকে এসব জেলার দূরত্ব অনেক। পরিবহণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণসহ নানান কারণে প্রতিবছর তাই উৎপাদিত আমের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ নষ্ট হয়। নষ্ট রোধ করে বিদেশে বাড়তি আম রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)।

রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৯ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন করবে ডিএই। অধিক আম উৎপাদন হয় এমন জেলার যেসব কৃষকের ৫০ শতকের বেশি কৃষিজমিতে আম বাগান রয়েছে। তাদের উপকারভোগী কৃষক হিসেবে বাছাই করা হবে। রপ্তানিমুখী বাজার সংযোগ স্থাপন প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ১ হাজার ৬২৩ মেট্রিক টন আম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আম যায় ইংল্যান্ড, ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও হংকংয়ে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, বছরে দেশে এক লাখ ৭৯ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়। প্রকল্পের আওতায় পাঁচ শতাংশ আমের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ আম নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষাসহ বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন বাড়ানো হলে রপ্তানি বাড়বে দ্বিগুণ।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

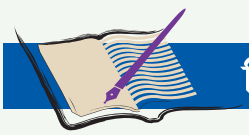

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে শিক্ষার মান আরও ভালো করা সম্ভব

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার মান ততটা খারাপ নয়। দেশে শিক্ষার মান ভালো, তবে আরও ভালো করা সম্ভব, এর সুযোগও রয়েছে। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিশ্বমানের গবেষণায় কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। শিক্ষায় র‍্যাঙ্কিংয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বেশি মনোযোগী হচ্ছে এবং আগামীতে বিশ্ব র‍্যাংঙ্কিংয়ে আরও অনেক ভালো করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ২২শে এপ্রিল চাঁদপুর সদর উপজেলা মিলনায়তনে ১ হাজার ২০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ধান বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন।

দক্ষতার পাশাপাশি মানবিক গুণও ফুটিয়ে তোলার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১০ই মে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, চলমান পৃথিবীর সঙ্গে তাল মেলানোর পাশাপাশি আগামী দিনের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষা খাতকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। এই মাস্টারপ্ল্যানে ই-লার্নিং-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি পেশাগত জীবনে সততা, দক্ষতার পাশাপাশি মানবিক গুণও ফুটিয়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

wewb‡qvM: we‡kl cwZ‡e`b

বাংলাদেশ সারা বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির বড়ো বাজার। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য শ্রম আইন সংশোধন করে বিশ্বমানের করেছে। দেশের কারখানাগুলো নিরাপদ ও কর্মবান্ধব করা হয়েছে। বিল্ডিং ও ইলেকট্রিসিটি সেইফটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তৈরি পোশাক কর্মীরা এখন নিরাপদ পরিবেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিড গ্রিন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সনদপ্রাপ্ত ১৫৭টি ফ্যাক্টরি রয়েছে। বিশ্বের প্রথম ১০টি গ্রিন ফ্যাক্টরির মধ্যে বাংলাদেশেই ৯টি। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এখন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ন্যায্যমূল্য (ফেয়ার প্রাইজ) নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ২৮শে এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাসের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশের স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১২ই এপ্রিল ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে '২০২৩ সালের এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার সিলেবাস' বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এসময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস বলেন, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। উভয় দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি

পাবে। এসময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব নূর মো. মাহবুবুল হক ও অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি-২) মো. আব্দুর রহিম খান উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ায় বর্ষসেরা তরুণ সাংবাদিক মৃদুলা আমিন

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মৃদুলা আমিন অস্ট্রেলিয়ায় বর্ষসেরা তরুণ সাংবাদিকের পুরস্কার জিতেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকতায় সম্মানজনক পুরস্কার 'দ্য ওয়াকলি অ্যাওয়ার্ডস'। ২০২১ সালে পুরস্কারটির তিনটি শাখায় সম্মানিত হন মৃদুলা আমিন। যার একটি 'সামগ্রিক বর্ষসেরা তরুণ অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক ২০২১'। ১৬ই এপ্রিল মৃদুলার এ পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *প্রথম আলো* পত্রিকায়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ১০ই মে ২০২২ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে নারীদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে সেলস ও ডিসপ্লে সেন্টার উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর প্রচ্ছদসহ বিশ্বখ্যাত একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মৃদুলার লেখা ও ছবি। তৈরি করেছেন *দ্য হিডেন পার্ক অব লাস্ট রিসোর্ট* নামের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রামাণ্যচিত্র। মূলত এসবের জন্যই তিনি বর্ষসেরা তরুণ সাংবাদিকের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন।

মৃদুলা আমিন ১৯৯৩ সালে ঢাকায় জন্ম নেন। পরের বছর মা-বাবার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যান। ২০১৮ সালে সিডনির ম্যাককুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও গণমাধ্যম বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি। আইনজীবী হিসেবে নিউ সাইথ ওয়েলস রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টে কাজ শুরু করেন মৃদুলা। পাশাপাশি খণ্ডকালীন সাংবাদিকতার কাজও করেন তিনি।

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম সুমাইয়া

চতুর্দশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় চূড়ান্ত ফলাফলে সহকারী জজ হিসেবে মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছেন সুমাইয়া নাসরিন। ২১শে এপ্রিল ১০২ জনের এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। সুমাইয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী। বর্তমানে তিনি স্নাতকোত্তর করছেন। তিনি শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপেই সাফল্য দেখিয়েছেন।

সীমান্ত রক্ষায় যুক্ত হচ্ছেন সৌদি নারীরা

সৌদি আরবের নারীদের জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে সৌদি সরকার। এখন প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোনো নারী চাইলে সীমান্ত রক্ষার কাজে যুক্ত হতে আবেদন করতে পারবেন। সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ ঘোষণা দিয়েছে এবং আবেদনের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। উল্লেখ্য, সৌদি নারীদের গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে দেশটির সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর পাশাপাশি রয়্যাল সৌদি স্ট্র্যাজিক মিসাইল ফোর্স এবং সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল কোরে চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সৌদি আর্মড ফোর্সেস উইমেনস ক্যাডেট ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম ব্যাচের নারী শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষ করে কাজে যোগ দিয়েছে। সৌদি আরব অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে গত পাঁচ বছরে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় দ্বিগুণ করেছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

৫২০ গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ

দেশের প্রতিটি উপজেলায় গৃহহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী-মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৫২০টি ঘর নির্মাণের কার্যক্রম থেকে ৪০০টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঘরগুলো গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই এপ্রিল সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি পুলিশের এই মানবিক কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। পুলিশের কাছ থেকে ঘর পেয়ে অনেক খুশি ৪০০ পরিবার। মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ায় ঘরে ঘরে এখন আনন্দ।

প্রতিটি ঘরের আয়তন ৪১৫ বর্গফুট। দৃষ্টিনন্দন পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে তৈরি। রয়েছে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সব কিছুরই ব্যবস্থা। নির্মিত প্রতিটি ঘরে মোট ৩টি কক্ষ রয়েছে। ঘরগুলো বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি কতৃর্ক অনুমোদিত। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, প্রতিবন্ধী ও উপার্জনে অক্ষম, অতিবৃদ্ধ ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার বা অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এটি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের একটি প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পুলিশের আইজি ড. বেনজীর আহমেদ বলেন, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বছরব্যাপী নানা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল পুলিশ। করোনা মহামারির কারণে সেসব পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়ায় কিছু অর্থ বেঁচে যায়। সেই অর্থ দিয়ে গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করে প্রধানমন্ত্রীর আবাসন কার্যক্রমে শামিল হয় বাংলাদেশ পুলিশ। ঘর পাওয়া ব্যক্তিরা অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আগে থাকতাম রাস্তাঘাটে। এখন ঘর পেলাম। এতদিনের দুর্দশার অবসান হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

হাওরে আগাম জাতের ধান চাষে গুরুত্বারোপ

হাওরে বোরো ধানের ঝুঁকি কমাতে স্বল্পজীবনকালীন আগাম জাতের ধান চাষ, টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও সময়মতো সংস্কারে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বৃদ্ধি এবং ধান পাকার পর তা দ্রুত কাটার জন্য হাওরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত ধান কাটার মেশিন কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার প্রদানে গুরুত্ব দিয়ে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। ১৬ই এপ্রিল সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার চাপতির হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ ও বোরো ধান ক্ষেত পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, হাওরে ১২-১৪ লাখ টন ধান হয়, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ধান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কোনো কোনো বছর আগাম বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এ ঝুঁকি কমাতে ১৫-২০ দিন আগে পাকে এমন জাতের ধান চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো জাত উদ্ভাবন করেছে। এসব জাত চাষে কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৪শে এপ্রিল ২০২২ ঢাকায় ফার্মগেটে কেআইবি কনভেনশন হলে 'বৈরী আবহাওয়ায় কৃষিজ উৎপাদন, অস্থিতিশীল বৈশ্বিক কৃষিপণ্যের বাণিজ্য' শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এসময় উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

ব্লাস্ট রোগ হওয়ায় ব্রি-২৮ ও দেরিতে পাকার কারণে ব্রি-২৯ ধান হাওরে চাষ না করার জন্য কৃষকদেরকে এসময় আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, হাওরের বিস্তীর্ণ জমিতে বছরে মাত্র একটি ফসল বোরো ধান হয়। এ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে, সেজন্য উচ্চফলনশীল জাতের ধান যেমন ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-৯২ এবং বিনা ধান-১৭ চাষ করতে হবে। বাঁধ ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিভিন্ন প্রণোদনা ও খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে বলেও জানান কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী বোরোতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার দেওয়া হবে। এছাড়া সারা বছর ধরে ভিজিএফসহ বিভিন্ন খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে খাদ্যের জন্য কেউ কষ্ট না করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পাশে আছেন। ফসল রক্ষায় টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও সময়মতো সংস্কারের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সকলে মিলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

শ্রমিক সংকটের কথা চিন্তা করে ও দ্রুততার সঙ্গে ধান কাটার জন্য হাওরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকার শতকরা ৭০ ভাগ ভর্তুকিতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার ও রিপার কৃষকদের দিচ্ছে। পর্যাপ্ত ধান কাটার যন্ত্র হাওরে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, দেশের অন্য অঞ্চল থেকেও যন্ত্র আনা হচ্ছে। বাঁধ রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি বিভাগ ও রাজনীতিবিদরা কৃষকের পাশে রয়েছে।

সর্বোচ্চ লবণসহিষ্ণু বিনা-১০ জাতের ধান চাষে সাফল্য

সাতক্ষীরার উপকূলীয় শ্যামনগর উপজেলায় লবণাক্ত জমিতে বিনা-১০ জাতের ধান চাষ করে সাফল্য অর্জন করেছেন কৃষক। এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ লবণসহিষ্ণু ধানের জাত। বাংলাদেশ কৃষি পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত লবণসহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল এ জাতের ধান পরীক্ষামূলকভাবে শ্যামনগর উপজেলার ৩০০ কৃষক চাষ করে দারুণ সাফল্য দেখান। বিনা-১০ জাতের ধানের উদ্ভাবক বাংলাদেশ কৃষি পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ময়মনসিংহের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জাল ইসলাম। ৪ঠা এপ্রিল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের সঙ্গে মাঠ দিবসে ধান কর্তনে অংশ নেন তিনি।

জানা যায়, বিগত তিন দশকের মধ্যে এ প্রথম তারা ধান চাষ করে সফল হয়েছেন। জমি ও ভূগর্ভস্থ পানিতে অতিমাত্রার লবণের কারণে এ এলাকায় ধান বা অন্য কোনো ফসল ফলে না। শুধু লবণ পানির চিংড়ি চাষের ওপর নির্ভর করে চলতে হয় তাদের। চলতি বোরো মৌসুমে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে প্রত্যেক কৃষক দুই থেকে তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে বিনা জাতের ধান চাষ করেন। সরকারিভাবে দেওয়া বীজে বীজতলা করে পরবর্তী সময়ে জমি চাষ ও চারা রোপণ করে কৃষকের বিঘাতে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিঘায় ১৭ থেকে ১৮ মণ পর্যন্ত ধান পাওয়া যাবে। এর আগে কখনো এমন ধানের উৎপাদন সম্ভব হয়নি। কৃষক খুবই খুশি এ জাতের ধান চাষ করে এবং আগামীতে আরও বেশি পরিমাণ জমিতে বিনা-১০ জাতের ধান চাষ করবেন বলেও জানান তারা।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ কৃষি পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ময়মনসিংহের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জাল ইসলাম বলেন, শ্যামনগর উপজেলার যেসব এলাকায় বিনা-১০ জাতের ধান চাষ করা হয়েছে সেসব এলাকার জমির লবণাক্ততার পরিমাণ কমপক্ষে ১৪ থেকে ১৫ ডিএস। কৃষকদের অভাবনীয় সাফল্য দেখে খুবই ভালো লাগছে। কেননা, এ ধানের জাত উদ্ভাবনের আগে বহুবার সাতক্ষীরার এ উপকূলীয় অঞ্চলে এসে মাটি ও পানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। কৃষকদের মাঝে আশার আলো দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। গবেষণা সফল হয়েছে। আগামীতে এ অঞ্চলের ধানের উৎপাদন অনেক গুণ বাড়বে বলে আশা করছেন তিনি।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি

সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে ২০১৫ সালে সর্বপ্রথম বাঘ গণনা করা হয়। ৪ঠা এপ্রিল পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, ২০১৫ সালে সুন্দরবনের বাঘ গণনা করে ১০৬টি বাঘ পাওয়া যায় এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি। এছাড়া সমগ্র সুন্দরবনে এক লাখ থেকে দেড় লাখ হরিণ, ১৬৫ থেকে ২০০টি কুমির এবং ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার বানর রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ ও কুমির নিধন বন্ধে সরকার ২০১২ সালে বন অধিদপ্তর, কোস্টগার্ড ও র‍্যাবের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে সুন্দরবন থেকে দুষ্কৃতকারী, জলদস্যু বিতাড়িত করা হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় পশু বাঘ রক্ষায় 'Bangladesh Tiger Action Plan' (২০১৯-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়েছে। সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী অপরাধ বন্ধে বনকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্মার্ট (SMART-Spatial Monitoring And Reporting Tool) টহল ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। উক্ত বিশেষ টহল ব্যবস্থায় দ্রুতগামী জলযান ও ড্রোন ব্যবহার করা হয়।

সুন্দরবনের চারটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের পরিমাণ পূর্বের ২৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫২ শতাংশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্যে টহল জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বন্যপ্রাণী প্রজনন মৌসুম জুন-জুলাই-আগস্ট এই তিন মাসে সুন্দরবনে সব ধরনের পাস-পারমিট বন্ধ রাখা হয়। সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল জেলে, বাওয়ালি, মৌয়ালিদের বাঘ, হরিণ ও কুমির নিধন বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক সভা ও উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী পাচাররোধে দুবলার চরে রাসমেলা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের রক্ষিত বন-ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত চারটি রেঞ্জে চারটিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রতিটি গ্রামে পিপলস ফোরাম, ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম, কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপ কার্যকর রয়েছে। এছাড়াও সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণের জন্য ৪৯টি ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম গঠন করাসহ সুন্দরবনে বাঘ ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত ব্যক্তির পরিবারকে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও মন্ত্রী জানান।

৫৪টি নদী দূষণমুক্ত করতে বেলা'র আইনি নোটিশ

দেশের ৫৪টি নদীকে দূষণমুক্ত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সংস্থার প্রধানদের আইনি নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)। নোটিশে নদীগুলোকে দূষণমুক্ত করতে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দাবি জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে নদীগুলোর দূষণের উৎস চিহ্নিত করে দূষণকারীদের পূর্ণ তালিকা তৈরি, দূষণকারীদের শাস্তি প্রদান, ক্ষতিপূরণ আদায়, প্রাণহীন নদীগুলোকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষণা ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানানো হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

এই নদীগুলো হলো: বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, মেঘনা, বালু, আড়িয়াল খাঁ, ময়নাকাটা, বিলপদ্ম, কীর্তিনাশা, সুতি, পারুলি, চিলাই, কালিগঙ্গা, পদ্মা, বানার, লৌহজং, বংশী (ঢাকা বিভাগ); যমুনা, করতোয়া, গঙ্গা, আত্রাই, নারোদ, ইছামতি (রাজশাহী বিভাগ); তিস্তা, খড়খড়িয়া (রংপুর বিভাগ); ক্ষীরু (ময়মনসিংহ বিভাগ); কর্ণফুলী, হালদা, বিল ডাকাতিয়া, তিতাস (চট্টগ্রাম বিভাগ); ময়ূর, ভৈরব, রুপসা, মাথাভাঙ্গা, পশুর, কাকশিয়ালী, গড়াই, মধুমতি, কুমার (খুলনা বিভাগ); কীর্তনখোলা, সুগন্ধা, লোহালিয়া, তেঁতুলিয়া, খাকদোনা, শিববাড়ীয়া (বরিশাল বিভাগ); সুরমা, কুশিয়ারা, সুতাং, সোনাই, কোরাঙ্গী, বরাক ও ধোলাই (সিলেট বিভাগ)।

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের বরাতে বেলা বলেছে, গবেষণায় ঢাকা ও আশপাশের ছয়টি নদী– বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা নদী দূষণের ভয়াবহতা উঠে এসেছে। এছাড়া চট্টগ্রামের কর্ণফুলী, উত্তরাঞ্চলের করতোয়া, তিস্তা, আত্রাই, পদ্মা, দক্ষিণাঞ্চলের কীর্তনখোলা, রূপসা ও লোয়ার মেঘনা নদীর পানিতে থাকা মাত্রাতিরিক্ত ধাতু মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে। সেচকাজে এ পানি ব্যবহারের ফলে খাদ্যের মাধ্যমে ভারী ধাতু দেহে প্রবেশ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। লোয়ার কুমার, ধলেশ্বরী, বালু, সুতি, পারুলি এবং চিলাই নদীতে শিল্প দূষণে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

সিংড়া বন থেকে ১৯টি হিমালয়ান শকুন অবমুক্ত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার সিংড়া বন থেকে ১৯ হিমালয়ান শকুন বা হিমালয়ান গ্রিফন অবমুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় এবং তিব্বত অঞ্চলের এই শকুনগুলো বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার করা হয়। ২রা এপ্রিল শকুনগুলো অবমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

শকুনগুলো উদ্ধারের পর বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) বাংলাদেশ চ্যাপটারের যৌথ উদ্যোগে দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার সিংড়া বনের শকুন সংরক্ষণ কেন্দ্রে আনা হয়। বেশিরভাগ শকুন জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানান দিনাজপুর জেলার বন কর্মকর্তারা। অবমুক্ত করার আগে বিভিন্ন কোডসহ একটি ট্যাগ শকুনগুলোর পায়ে ও ডানায় বসানো হয়। ২ সপ্তাহ আগেও ৭টি শকুন অবমুক্ত করা হয়েছিল।

আইইউসিএন-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রাকিবুল আমিন বলেন, ১৯৯০ সালের দিকে বাংলাদেশে শকুনের ছয়টি প্রজাতি দেখা যেত। তবে পাখির সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সেগুলোর অধিকাংশই বিলুপ্তির পথে। তিনি আরও জানান, শকুনের হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতিটিও বিলুপ্তপ্রায় পাখি। প্রতিবছর শীত

মৌসুমে হিমালয় অঞ্চল থেকে পরিযায়ী পাখি আসে বাংলাদেশে। তবে এখানে পাখিগুলোকে নানান প্রতিকূলতার মুখে পরতে হয়। বসবাসের জন্য গাছ ও খাদ্যের সংকট তাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

রাকিবুল আমিন বলেন, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির ১৪৯টি শকুন উদ্ধার করা হয়েছে। যেগুলো পরবর্তীতে শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন বলেন, শকুন প্রকৃতি পরিচ্ছন্নকারী। তারপরও এই উপকারী পাখিটি বিলুপ্তির মুখে রয়েছে। এই পাখির সংখ্যা বাড়াতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

মে মাসে ২৩ লাখ মানুষকে কলেরার টিকা খাওয়ানোর কর্মসূচি

রাজধানীর পাঁচটি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে মে মাসে ২৩ লাখ মানুষকে কলেরার টিকা খাওয়ানোর কর্মসূচি পরিচালিত হবে। সাম্প্রতিক ডায়রিয়া প্রাদুর্ভাব বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশেষ ভার্চুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে ১৩ই এপ্রিল এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ২৪শে এপ্রিল ২০২২ ঢাকায় মহাখালীতে নিপসম অডিটোরিয়ামে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্যে বলা হয়, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকার যাত্রাবাড়ি, দক্ষিণখান, মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও সবুজবাগ এলাকায় কলেরার টিকা খাওয়ানো হবে। মে মাসে প্রথম ডোজ আর জুন মাসে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। এক বছর বয়স থেকে সব বয়সি মানুষ কলেরার টিকা পাবেন। শুধু গর্ভবতী নারীদের এ টিকা খাওয়ানো হবে না। উল্লেখ্য, ঢাকায় মার্চের মাঝামাঝি থেকে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়। এ সময়ে রাজধানীর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) হাসপাতালে প্রতিদিন রেকর্ডসংখ্যক রোগী ভর্তি হয়।

করোনা আক্রান্তের ছয়মাস পরও উচ্চ ঝুঁকি

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের বেশি সময় পরও আক্রান্ত ব্যক্তিদের শরীরে রক্তজমাট বাঁধার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এমনকি করোনার মৃদু উপসর্গ থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই ঝুঁকি রয়েছে। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে* (বিএমজে) সাতই এপ্রিল প্রকাশিত এক গবেষণা ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে।

সুইডেনে করা এ গবেষণায় করোনায় আক্রান্ত ১০ লাখের বেশি মানুষের তথ্যের সঙ্গে করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ আসা এমন ৪০ লাখের বেশি মানুষের তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, করোনায় আক্রান্ত যেসব ব্যক্তির ফুসফুসে সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকি ছিল, তাদের করোনা সংক্রমণের ছয় মাসের বেশি সময় পরও শরীরে রক্তর জমাট বাঁধার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে, যা ফুসফুসের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়। এখানে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

wbivc` moK : we‡kl cwZ‡e`b

মহাখালী-বনানী লেকে ওয়াটার বাস

ঢাকাবাসীকে যানজটের কবল থেকে রক্ষা করতে হাতিরঝিল হয়ে কালাচাঁদপুর-মহাখালী-বনানী পর্যন্ত লেক এলাকা সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এতে ওই এলাকার ১২ কিলোমিটার রুটেও চলবে ওয়াটার বাস। এসব এলাকায় উন্নয়নের ফলে যানজটের কবল থেকে স্বস্তি পাবে এসব রুটে চলাচল করা নগরবাসী। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও আসবে নতুনত্ব।

'ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত হাতিরঝিলের উপ-শাখা খাল (বনানী-বারিধারা-নাড়িয়া খাল) সংস্কার, পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি, নৌ-যোগাযোগ, বিনোদন সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্পের আওতায় এ সংস্কার কাজ করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত মোট ব্যয় এক হাজার ৩৫৮ কোটি ৫২ লাখ টাকা। ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে। এরই মধ্যে প্রকল্পের প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্র জানায়, প্রকল্পের আওতায় ১২ কিলোমিটার লেকপাড় উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ হবে। একইসঙ্গে থাকবে ৯ দশমিক ৭২ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে, ৮৭৮ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি ফুটওভার ব্রিজ, ছয়টি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও ২২টি ভিজিটর শেড। লেকপাড়ের জনসাধারণের চলাচল সুবিধার পাশাপাশি থাকবে বিনোদনের ব্যবস্থা। ১২ কিলোমিটারের এ লেকপাড় ঘিরে নগরবাসীর জন্য গড়ে তোলা হবে বিনোদন কেন্দ্র। লেকের পানির গুণগত মানোন্নয়ন ও পানি সংরক্ষণেও থাকবে বিশেষ মনোযোগ।

এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) এ এইচ এম কামরুজ্জামান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, হাতিরঝিল হয়ে কালাচাঁদপুর-মহাখালী-বনানী পর্যন্ত লেক এলাকার সংস্কার ও উন্নয়ন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ১২ কিলোমিটার রুটে ওয়াটার বাস চলাচলের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়নের পাশাপাশি নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও আসবে আমূল পরিবর্তন। এসব বিষয়

মাথায় রেখেই প্রকল্পের প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী বলেন, আমরা নতুন করে হাতিরঝিল হয়ে মহাখালী ও বনানী খাল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। এর মাধ্যমে নৌপথে নতুন যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। কয়েকটি ব্রিজও নির্মাণ করা হবে। হাতিরঝিলে যেমন ওয়াটার বাস চালু আছে, অনেকে সহজে যাতায়াত করতে পারেন।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য

লেকের পাড় সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পানির গুণগতমান ও প্রবাহ বাড়ানো, পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে নৌ যোগাযোগ স্থাপন, লেক সংলগ্ন এলাকার পরিলক্ষিত পানি নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। বাইসাইকেল লেনসহ হাঁটার রাস্তাও থাকবে। প্রকল্পের আওতায় কেনা হবে একটি জিপ, দুটি পিকআপ ও চারটি মোটরসাইকেল। এছাড়া প্রাকৃতিক উপায়ে ১২ কিলোমিটার রুটের ঢাল রক্ষা, ২০০ মিটার রিটেইনিং দেওয়াল নির্মাণ, ৪ হাজার ৭০৬ মিটার ওয়াকওয়ে, সাড়ে ৯ কিলোমিটার ভাসমান ওয়াকওয়ে ও ৮১০ মিটার বাউন্ডারি পিলার নির্মাণ করা হবে।

একইসঙ্গে এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯৪৮ মিটারের দুটি ফুটওভার ব্রিজ, ১৭ দশমিক ৬৭ কিলোমিটার ড্রেনেজ, শিশুতোষ বিনোদন কেন্দ্র, ১৪ হাজার বৃক্ষরোপণ, ১০ হাজার মিটার সবুজায়ন, ১৯১টি বসার বেঞ্চ, এক হাজার ৭৮০টি ডাস্টবিন, তিনটি সৌর জলজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। এছাড়াও নির্মাণ হবে ৫০টি টিকিট কাউন্টার, ঘাট, প্ল্যাটুন, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, ভিজিটর শেড নির্মাণ ও পাবলিক টয়লেট। পদ্মপুকুর, ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল, ওয়াইফাইসহ সিসিটিভি সিস্টেম ও বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী লেকের পাশে বিনোদন সুবিধা পাবে। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাস্তবায়িত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নৌ যোগাযোগের জন্য লেকপাড়ের স্থানীয় এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানের মানুষ ভোগ করবে লেকের সুবিধা।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, ঢাকা মহানগরীতে যে কয়েকটি জলাশয় অবশিষ্ট আছে এর মধ্যে অন্যতম হাতিরঝিল থেকে কালাচাঁদপুর-মহাখালী হয়ে বনানী কবরস্থান পর্যন্ত লেক। রয়েছে হাতিরঝিল থেকে নাড়িয়া পর্যন্ত খাল। হাতিরঝিল থেকে বালু নদী পর্যন্ত জলাশয়টি এখন রামপুরা-বনশ্রী খাল নামে পরিচিত। শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে জলাধার সংরক্ষণ, এর মধ্য দিয়ে জীববৈচিত্র্যের সম্প্রসারণ, অক্সিজেন সরবরাহ এবং একইসঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। বিগত কয়েক বছরে রাজধানীর খাল-জলাশয়গুলোর পানির গুণগতমানের উন্নতি দৃশ্যমান।

নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ অবস্থা নিরসনে জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীর সব লেক, লেকপাড়, পাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন। লেক ও লেকের পাড় সংরক্ষণের মাধ্যমে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিই নয়, বরং সেসব এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত করা সম্ভব হবে।

বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বারিধারা লেক প্রকল্পের সঙ্গে হাতিরঝিল হয়ে কালাচাঁদপুর-মহাখালী-বনানী পর্যন্ত লেক এলাকার সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের মিল রয়েছে। যেখানে সবগুলো প্রকল্পের আওতায়ই পার্শ্ববর্তী ভূমির উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

we`ÿr : we‡kl cwZ‡e`b

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত হলো জেনারেটর স্টেটার

টার্বাইন হলের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মধ্যে জেনারেটর স্টেটার অন্যতম, যার কাজ হলো টার্বাইন থেকে প্রাপ্ত যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের টার্বাইন হলে নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে সফলভাবে জেনারেটর স্টেটারের স্থাপন সম্পন্ন করেছে। ৫ই এপ্রিল এটি স্থাপন করা হয়।

প্রকল্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রূপপুর এনপিপি নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক আলেক্সেই ডেইরি জানান, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সব যন্ত্রপাতির মধ্যে জেনারেটর স্টেটার সবচেয়ে ভারী। এর ওজন ৪৪০ টনের বেশি। ডিজাইন অবস্থানে এর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবার পর এখন টার্বাইন হলে মূল যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রক্রিয়া পুরোদমে চলতে থাকবে। উল্লেখ্য, টার্বাইন জেনারেটর (টিজেডভি-১২০০০-২) ডিজাইন তৈরি করেছে 'পাওয়ার মেশিন্স'। এ জাতীয় টার্বাইন জেনারেটরের অতিরিক্ত কিছু সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে অগ্নি নিরাপত্তা, অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা, উচ্চ ওভারলোড বহন ক্ষমতা অন্যতম। রূপপুর প্রকল্পে স্থাপিত হচ্ছে দুটি ৩য় প্রজন্মের

রাশিয়ার ভিভিইআর-১২০০ রিয়্যাক্টর যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২,৪০০ মেগাওয়াট। রাশিয়ার রিয়্যাক্টর মডেলটি সব আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে সক্ষম। প্রকল্পের জেনারেল কন্ট্রাকটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রসাটমের প্রকৌশল বিভাগ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাঁশি বাজিয়ে ও পতাকা নাড়িয়ে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৩০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভের উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

দেশের সর্ববৃহৎ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

কক্সবাজারের পেকুয়ায় ৩১শে মার্চ দেশের সবচেয়ে বড়ো ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৌর বিদ্যুৎ, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ ইত্যাদি নবায়নযোগ্য জ্বালানি আগামী দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কয়েকটি প্রকল্পে ২৪৫ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারকে ঘিরে যে উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনা করছেন তার অংশ এ বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ড

শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনে (১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট) রেকর্ড হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড হয়েছে ১৬ই এপ্রিল। এসময় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ছিল মাত্র ৩ হাজার ২৬৮ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর আগে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ছিল ১২ই এপ্রিল ১৪ হাজার ৪২৩ মেগাওয়াট।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

নৌ নিরাপত্তায় ১০টি সুপারিশ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নৌপথে নিরাপদ যাতায়াতের স্বার্থে ১০টি সুপারিশ জোরদারের দাবি জানিয়েছে নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি। ১০ই এপ্রিল সংগঠনের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ শহীদ মিয়া সাধারণ বিবৃতিতে এই দাবিগুলো উত্থাপন করেন। ভরা দুর্যোগ মৌসুমে ঈদ উদ্‌যাপিত হওয়ায় এই বিবেচনায় ১৭ই এপ্রিল থেকে সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন শুরু ও ঈদ পরবর্তী ১০দিন অব্যাহত রাখার তাগিদ দেওয়া হয় বিবৃতিতে।

সুপারিশগুলো হলো– বিদ্যমান অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা রোধে নদীবন্দর ও নৌপথসমূহে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম শুরু। নৌ পরিবহণ অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএতে অস্থায়ী ভিত্তিতে অন্তত চারজন করে নির্বাহী হাকিম পদায়ন দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংখ্যাবৃদ্ধি। পদ্মার শিমুলিয়া-বাংলাবাজার ও পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ফেরি ও লঞ্চ চলাচলে বিশৃঙ্খলা এড়াতে পর্যাপ্তসংখ্যক র‍্যাব, পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন। শিমুলিয়া-দৌলতদিয়াসহ সকল নৌপথে লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ। উপকূলীয়, হাওর ও পাহাড়ি জনপদে অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ লঞ্চ চলাচল বন্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা ও পুলিশ প্রশাসনকে সম্পৃক্তকরণ। সারা দেশে যাত্রী ও পণ্যবাহীসহ যে-কোনো ধরনের অনিবন্ধিত ও ত্রুটিপূর্ণ নৌযানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত রাখা। গুরুত্বপূর্ণ নৌপথসমূহে কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশের তৎপরতা জোরদারকরণ। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে টেলিভিশন ও বেতারে প্রতি ঘণ্টায় আবহাওয়ার সতর্কতার জন্য টার্মিনাল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলোতে বড়ো পর্দায় ও লাউড স্পিকারে আবহাওয়ার বার্তা প্রচার, লঞ্চ ও স্টিমারসহ সব ধরনের যাত্রীবাহী নৌযানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ।

জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া টিকিট নয়

জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ছাড়া ঈদ যাত্রায় লঞ্চের টিকিট বিক্রি করা হবে না বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। সচিবালয়ে নৌ মন্ত্রণালয়ের ঈদ প্রস্তুতি বিষয়ক এক সভায় ১০ই এপ্রিল গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা জানান। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমরা সবাই সমন্বয় করে যাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে চাই। আমরা শতভাগ চেষ্টা করব। আমরা যেমন যাত্রী পরিবহণের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তেমনি যাত্রীদের কাছেও আমাদের আবেদন তারাও যেন নির্দেশনাগুলো প্রচার করে। অপরিকল্পিতভাবে তারা যেন ঈদ যাত্রা না করে সেটা আমাদের অনুরোধ থাকবে যাত্রীদের প্রতি। তিনি আরও বলেন, লঞ্চমালিকরা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে নিয়ে লঞ্চগুলো ঈদ যাত্রায় যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা সবচেয়ে সংকটে পড়েছি আমাদের গর্বের পদ্মা সেতু নিয়ে। পদ্মা সেতুর নিচ দিয়ে ফেরি চলাচলে বিধিনিষেধ আছে। সেই কারণে আমরা অনেক ফেরি প্রত্যাহার করে নিয়েছি। এখন শিমুলিয়া-বাংলাবাজার ঘাট রুটে ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মাত্র ৬টি ফেরি চলছে। পদ্মা বহুমুখী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমরা চেষ্টা করব এটা ২৪ ঘণ্টা চলাচল করতে পারে। মাঝিকান্দিতে একটি মাত্র ঘাট। আমরা নির্দেশনা দিয়েছি, আগামী ৪ দিনের মধ্যে সেখানে নতুন আরেকটি ঘাট তৈরি হবে।

এই রুটে আমাদের ৮৩টি লঞ্চ আছে। সেগুলো যেন ধারাবাহিকভাবে ২৪ ঘণ্টা চলে আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়েছি। স্পিড বোট রাতে চলবে না। দিনে বালুবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে। লঞ্চের ক্ষেত্রে যাত্রীদের জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি দিতে হবে টিকিট সংগ্রহ করার আগে। কেবিনে হোক বা ডেকেই হোক লঞ্চে উঠতে গেলে পরিচয়পত্রের কপি সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া টিকিট দেওয়া সম্ভব হবে না। যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

১০ লাখ কর্মীর বিদেশ যাত্রা

এবছর ১০ লাখ কর্মীর বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রতিমাসে গড়ে এক লাখ কর্মী বিদেশে গমন করছে। যার মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ হাজার কর্মী সৌদি আরব যাচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ২০শে এপ্রিল ঢাকায় নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিলে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, গত দুই মাসে ১ লাখ ৭০ হাজার ভিসা ইস্যু করেছে ঢাকায় সৌদি দূতাবাস। প্রতিদিন গড়ে ৪ হাজার ভিসা ইস্যু করেছে দেশটি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ১১ই এপ্রিল ২০২২ ঢাকায় শ্রম ভবনে ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাসের বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিটিসি)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, বিদেশে কর্মী পাঠাতে এখন সরকার দক্ষতার ওপর জোর দিচ্ছে। এ সময় অন্যান্য অংশীজন তাদের বক্তব্যে অভিবাসন খাতে আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা মালয়েশিয়া ও লিবিয়ার শ্রমবাজারে পুনরায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী প্রেরণের ওপর জোর দেন। এছাড়া রোমানিয়ার শ্রমবাজার নিয়েও তারা আলোচনা করেন। মতবিনিময় সভায় অংশ নেন ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশন প্রধান, ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রধান, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ অন্যান্যরা।

পিএসসি নন-ক্যাডারে নেবে ২৭৫ জন

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নন-ক্যাডারে নিয়োগের জন্য ২৭শে এপ্রিল পিএসসির ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নবম ও দশম গ্রেডের ১৫টি পদে মোট ২৭৫ জন নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গ্রন্থাগারিক পদে ১ জন, নেটওয়ার্ক/ওয়েবসাইট ম্যানেজার পদে ১ জন, ডেটাবেইজ ম্যানেজার পদে ১ জন, কম্পিউটার প্রোগ্রামার পদে ৪ জন, সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী পদে ২ জন, জুনিয়র প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নবিদ পদে ১ জন ও উপসহকারী প্রকৌশলী (টেলিভিশন) পদে ১ জন। এছাড়া সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পদে ১০৮ জন, সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ৮৮ জন, পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারিক পদে ১ জন, সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ১ জন, সিনিয়র স্টাফ নার্স ৬২ জন, ডিজাইনার ১ জন, ডিজাইনার সুপারভাইজার ১ জন ও নার্স ২ জন।

আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের ওয়েবসাইট http://bpsc.teletalk.com.bd বা পিএসসির ওয়েবসাইটের www.bpsc.gov.bd মাধ্যমে কমিশনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। ৩০শে মে-এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন পূরণ করা যাবে।

৪৭১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে এনটিআরসিএ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আওতায় ৪৭১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৭১ প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ দিবে। প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। ২৫শে এপ্রিল এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করে এনটিআরসিএ।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন

বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ। ১৫৭ বছর আগে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ক্ষণজন্মা এই মানুষটির জন্ম হয়। তাঁর লেখনীতে বাংলা সাহিত্যের সবকটি ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সংগীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। সৃষ্টিশীলতার সমান্তরালে তিনি ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজভাবনা সমানভাবেই চালিয়ে গেছেন। বিশ্বভারতী তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথ *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী তিনিই প্রথম এশীয় ও একমাত্র বাঙালি লেখক। রবীন্দ্রসাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর তাঁর গানই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাণীতে বলেন, রবীন্দ্রনাথের দ্যুতিময় উপস্থিতি আমাদের ব্যক্তিক, জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও বাঙালির অহংকার। অসাধারণ সব সাহিত্যকর্ম দিয়ে তিনি বিস্তৃত করেছেন বাংলা সাহিত্যের পরিসর। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে, জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি ক্রান্তিকালে আমাদের পাশে থাকেন রবীন্দ্রনাথ।

এবার রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে কবির স্মৃতিধন্য শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসর ও দক্ষিণ ডিহি-পিঠাভোগে উদ্‌যাপিত হয় সরকারি আয়োজনে নানা অনুষ্ঠান। দেশব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমি ও ছায়ানট আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

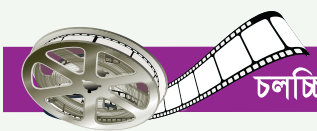

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ঈদের ছবিতে সাফল্য

ঈদুল ফিতরের ছবিগুলো বেশ সাফল্য পেয়েছে। এবারের ঈদে মুক্তি পেয়েছে চারটি ছবি। ছবিগুলো হলো– *গলুই*, *শান*, *বিদ্রোহী* এবং *বড্ড ভালোবাসি*। এই ছবিগুলোর মধ্যে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে *শান*। রাজধানীর হলগুলোতে সপ্তাহজুড়ে হাউসফুল চলে ছবিটি। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে *গলুই* আশাতীত সাড়া জাগিয়েছে এবং *বিদ্রোহী* দর্শকদের মন কেড়েছে।

গলুই ও *বিদ্রোহী*-র নায়ক শাকিব খান এবং *শান* ছবিতে অভিনয় করেছেন সিয়াম। বরাবরের মতো এবারো ঈদে দুই ছবি নিয়ে রাজত্ব ছিল শাকিব খানের। তার অভিনীত *গলুই* ২৮টি হলে আর *বিদ্রোহী* মুক্তি পায় ১০৩টি হলে। ঈদে শাকিবের এই রাজত্বে পা রাখেন নতুন নায়ক সিয়াম আহমেদ। তার অভিনীত *শান* মুক্তি পায় ৩৪টি হলে।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫২টি শহরে wiKkv Mvj

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রদর্শন হয়েছে অমিতাভ রেজার *রিকশা গার্ল* সিনেমাটি। মে মাসজুড়ে দেশটির ১৮টি রাজ্যের ৫২টি শহরে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করেন দর্শকরা। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার বিজয়ী *রিকশা গার্ল*-এর প্রদর্শনী যেসব রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো হচ্ছে– নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ফিলাডেলফিয়া, টেক্সাস, ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, ফ্লোরিডা, ওহাইও, ওকলাহোমা, লুইজিয়ানা, অ্যারিজোনা, অরেগন, নর্থ ক্যারোলাইনা, ইলিনয়, মিশিগান, ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়াতে।

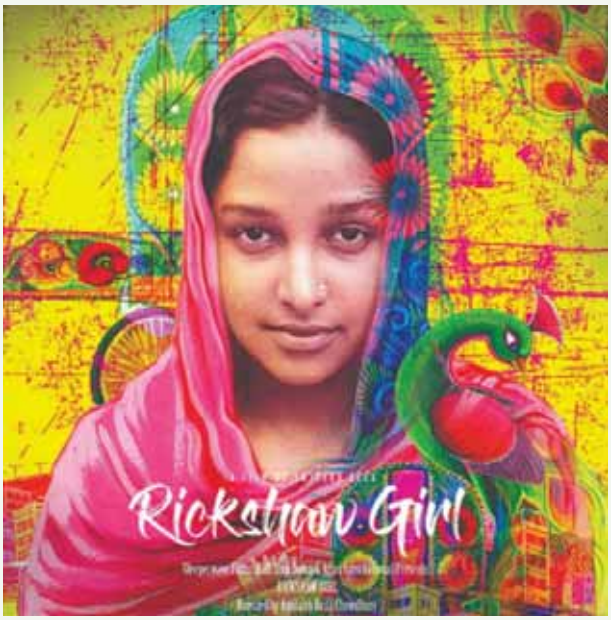

৫ই মে ম্যানহাটনের ঐতিহ্যবাহী মুভি থিয়েটার *ভিলেজ ইস্ট বাই অ্যাঞ্জেলিকায়* জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে *রিকশা গার্ল*-এর প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

মে মাসজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বড়ো শহরেই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রিকশা গার্ল-এর স্ক্রিনিংয়ের দায়িত্বে রয়েছে 'বায়স্কোপ ফিল্মস'। প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন সিনেমাটির নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী, নির্বাহী প্রযোজক আসাদুজ্জামান সকাল, সহ-প্রযোজক মাহজাবিন রেজা, কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনয়শিল্পী নভেরা রহমান, মোমেনা চৌধুরীসহ অন্যান্যরা। এছাড়া সিনেমাপ্রেমীরা চলচ্চিত্রটির কলাকুশলীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি পরিচালকের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বেও মিলিত হন।

আয়নাবাজি সিনেমার মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখেন অমিতাভ রেজা। ছবিটি দারুণ দর্শকপ্রিয়তা পায়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের লেখক মিতালি পারকিনসের কিশোরসাহিত্য *রিকশা গার্ল* অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে এই চলচ্চিত্রটি।

'নাইমা' নামের এক কিশোরীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে *রিকশা গার্ল* ছবিটির গল্প। শিল্পী নভেরা রহমান সিনেমাতে নাইমা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন– চম্পা, মোমেনা চৌধুরী, নরেশ ভূঁইয়া, অ্যালেন শুভ্র ও অন্যান্যরা। এ চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখেছেন নাসিফ ফারুক আমিন ও শর্বরী জোহরা আহমেদ।

ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসকট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', জার্মানির 'শ্লিঙ্গেল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতেছে ও সিনেমা সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে *রিকশা গার্ল* চলচ্চিত্রটি। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই সিনেমার প্রযোজকরা হলেন– জিয়াউদ্দিন আদিল, ফরিদুর রেজা সাগর ও এরিক জে অ্যাডামস।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

সীমান্তে মাদক ও চোরাচালান বন্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার

দেশের সীমান্ত জেলাগুলোতে মাদক ও চোরাচালান বন্ধে সীমান্তে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত এক সভায় এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, সীমান্ত এলাকা দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ভয়ংকর মাদক ক্রিস্টাল মেথ বা আইস ও ইয়াবা আসছে। এসব মাদকের প্রবেশ রোধে সীমান্তে অত্যাধুনিক সেন্সর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকার সব ধরনের চোরাচালান প্রতিরোধের চেষ্টা করছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. সাইফুল হাসান বাদলের নেতৃত্বে ৩১শে মে ২০২২ জাতীয় শহিদমিনার চত্বর থেকে 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে– পিআইডি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ মাদক তৈরি করে না। মাদক থেকে তরুণ যুবসমাজকে রক্ষায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে সরকার। সীমান্তে সেন্সর বসানোর পাশাপাশি আরও স্পিড বোটের সংখ্যা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মাদকের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। মানবপাচার, মাদকের লেনদেন নিয়ন্ত্রণে কোস্টাল এরিয়ায় কোস্টগার্ড সতর্ক রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শতাধিক পয়েন্ট ও মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে মাদক বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। কোন পয়েন্ট দিয়ে কী ধরনের মাদক প্রবেশ করছে, তার তথ্য উদ্‌ঘাটন করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। ভারতের সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদক প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য কঠোরভাবে ভারতের নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে।

১৪৩ কোটি টাকার চোরাচালান-মাদক জব্দ বিজিবির

এপ্রিল মাসজুড়ে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১৪৩ কোটি ১ লাখ ২৮ হাজার টাকা মূল্যের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। ৫ই মে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম। তিনি জানান, জব্দ মাদকের মধ্যে রয়েছে ১৫ লাখ ৯৩ হ্যাচার ২০৫ পিস ইয়াবা, ৩ কেজি ১৯২ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৭ কেজি ১৫০ গ্রাম হিরোইন, ৪ কেজি আফিম, ২২ হাজার ৮৫৪ বোতল ফেনসিডিল, ১০ হাজার ৩৮৬ বোতল বিদেশি মদ, ৪ হাজার ৬০৮ ক্যান বিয়ার, ২ হাজার ৫৭১ কেজি গাঁজা, ৫০ হাজার ১০২টি ইনজেকশন, ৫ হাজার ৪৪টি ইস্কাফ সিরাপ, ৫৬৭ বোতল এমকেডিল/ কফিডিল, ২লাখ ৬৩ হাজার ৫১৬ পিস বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, ২৫ হ্যাচার ৬০৫টি অ্যানেগ্রা/ সেনেগ্রো ট্যাবলেট, ২ বোতল এলএসডি ও ৮৬ হাজার ১৬৩টি অন্যান্য ট্যাবলেট। এছাড়া জব্দকৃত অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ১৫ কেজি ৯৫৪ গ্রাম স্বর্ণ, ২৬ কেজি রুপা, ৩ লাখ ১০ হাজার ৩০টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ৪৪ হাজার ২৪০টি ইমিটেশন গহনা, ২০ হাজার ৫১টি শাড়ি, ৪ হাজার ৫৮৩টি থ্রিপিস/শার্টপিস/চাদর/কম্বল, ১ হাজার ২০৬টি তৈরি পোশাক, ২ হাজার ৯২৫ ঘনফুট কাঠ, ৭ হাজার ২৮ কেজি চা পাতা, ৩০ হাজার ৪৫০ কেজি কয়লা, ৩টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ১৪টি ট্রাক/ কার্ভার্ড ভ্যান, ৫টি প্রাইভেট কার/ মাইক্রোবাস, ৮টি পিকআপ ভ্যান, ২৭টি সিএনজি/ ইজিবাইক ও ৭৩টি মোটরসাইকেল। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ২টি পিস্তল, ৪টি গান, ২১ রাউন্ড গুলি ও ৩ কেজি ৪০০ গ্রাম গান পাউডার। এছাড়া সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৫১ জন চোরাচালানিকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ১৪৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক ও ৯ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

তিন পার্বত্য জেলায় বৈসাবি উৎসব

তিন পার্বত্য জেলায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হলো বৈসাবি উৎসব। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খিয়াং, লুসাই, পাংখোয়া, ম্রো, খুমি, চাক ও রাখাইনসহ সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায় তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে প্রতিবছর 'বৈসাবি' উৎসব পালন করে থাকে। এবছর সকল স্তরের মানুষ এ উৎসবে মেতে উঠেছিল।

খাগড়াছড়ি জেলার প্রধান নদী চেঙ্গীসহ ছোটোবড়ো বিভিন্ন নদীতে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে খাগড়াছড়িতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রধান সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি'। মহামারি করোনার কারণে গত দুই বছর ধরে বৈসাবি উৎসবের আয়োজনে ছিল নানা সীমাবদ্ধতা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রাণের এ উৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠেছে পাহাড়ের মানুষ। বৈসাবি উৎসবের মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে বসবাসরত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়।

রাঙামাটিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বৈশাখি পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বৈশাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে রাঙামাটি রাজ বনবিহারে ১৬ই মে দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈশাখি পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করা হয়। গৌতম বুদ্ধের জন্মতিথি ও বন্ধুত্ব ও পরিনির্বাণ লাভ উপলক্ষে রাজ বনবিহারে বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরে বিভিন্ন বিহারে বুদ্ধ পূজা, পিণ্ড দান, প্রাতঃরাশ, অষ্টপরিষ্কার দান, সংঘ দান, বুদ্ধমূর্তিদান, প্রদীপ পূজাসহ দিনব্যাপী কর্মসূচি উদ্‌যাপন করা হয়। বৈশাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য উন্নয়ন চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংসুই ক্রু চৌধুরী। এসময় রাঙামাটি রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, রাঙামাটি জেলা পরিষদ সদস্য ইলিপন, পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও দায়ক-দায়িকারা উপস্থিত ছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজার হাজার দায়ক-দায়িকা অংশগ্রহণ করেন। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দায়ক-দায়িকার উদ্দেশে ধর্মীয় দেশনা প্রদান করেন রাঙামাটি রাজ বনবিহারের আবাসিক প্রধান শ্রীমৎ প্রজ্ঞলংকার মহাস্থবির।

প্রতিবেদনঃ আসাব আহমেদ

wkï I wK‡kvi Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

শত বালিকাকে বাইসাইকেল দিলো প্রাণ-আরএফএল

যশোরের অভয়নগর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী মহাকাল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ২৩শে এপ্রিল ১০০ কিশোরীকে বাইসাইকেল ‘স্বপ্নতরী’ উপহার দিয়েছে প্রাণ-আরএফএল। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা রহমাতুল মুনিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে স্কুলে আসা শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ করেন। বিদ্যালয়ের সভাপতি সাবেক পৌর কাউন্সিলর আব্দুল গাফফার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। সাইকেল পেয়ে তুমুল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। তারা এই স্বপ্নতরী সাইকেলে চড়ে শত বাধা পেরিয়ে আগামীর স্বপ্ন জয়ের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

আগামী বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে সকল বিষয়ে পরীক্ষা হবে

করোনা মহামারির কারণে গত শিক্ষাবর্ষে এসএসসি এবং এইচএসসি সীমিত বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ২০২৩ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ২০২২ সালের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সব বিষয়ের পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান(ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক তপন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ কথা জানানো হয়েছে। ৮ই মে জারি করা এই আদেশ ১২ই মে প্রকাশিত হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের এসএসসি ও সমমান এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ২০২২ সালের পুনর্বিন্যাস করা পাঠ্যসূচির অনুযায়ী সব বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে। অফিস আদেশে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনঃ নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী মায়ের মমতায় প্রতিবন্ধীদের বুকে টেনে নিয়েছেন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, মায়ের মমতা দিয়ে প্রতিবন্ধীদের বুকে টেনে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল। শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে দেশ আজ এগিয়ে গিয়েছে। ১লা মে ২০২২ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সিংড়া পৌরসভার আয়োজনে প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পৌরসভার ১৭৫ জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ সামগ্রী ও পথশিশুদের মাঝে নতুন পোশাক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিংড়া পৌরসভার মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম সামিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে তিনজন প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

সরকার অনাথ শিশুদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, দেশের প্রতিটি শিশু যাতে স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠে সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। দুস্থ ও অনাথ শিশুদের কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২১শে এপ্রিল মন্ত্রী রাজধানীর তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারে (বালিকা) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহফুজা আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু। এসময় মন্ত্রী বলেন, শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদেরকে স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ দিতে হবে। সরকার অনাথ শিশুদের জন্য সরকারি শিশু নিবাসে শিক্ষা ও বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠার ব্যবস্থা করেছে। শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে এ প্রতিষ্ঠানসমূহে আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার শিশু নিবাসের পরিসর বাড়ানোর জন্য কাজ করছে। আগামীতে নিবাসীরা আরও উন্নত পরিবেশে এখানে বেড়ে উঠবে।

নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ‘সার্ভিস ডেস্ক’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই এপ্রিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সারা দেশের সব (৬৫৯) থানায় ‘সার্ভিস ডেস্ক’ উদ্‌বোধন করেন। এছাড়া গৃহহীন পরিবারের জন্য পুলিশের নির্মিত

৪০০টি বাড়ি হস্তান্তর করেন তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের দুটি মানবিক উদ্যোগ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, বিভিন্ন থানায় সার্ভিস ডেস্ক স্থাপিত হওয়ায় নারীদের জন্য অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। গৃহহীন পরিবারের জন্য পুলিশের ঘর নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ১১ই মে ২০২২ যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সংগঠকদের মাঝে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ২০১৩-২০২০' প্রদান করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে মূল অনুষ্ঠান হয়। 'সার্ভিস ডেস্ক' খোলার জন্য প্রতিটি থানায় আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নারী সাব-ইন্সপেক্টর প্রশিক্ষিত নারী অফিসারদের সঙ্গে ডেস্কের নেতৃত্ব দেবেন। এছাড়া ডেস্কগুলোকে অন্যান্য সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিতের পাশাপাশি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসে স্বর্ণ জিতল বাংলাদেশ

প্রথমবার কোনো আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে স্বর্ণ জিতেছে বাংলাদেশ। ১০ই মে মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কাকে ২-৩ গেমে হারিয়ে দক্ষিণ এশিয়ান জুনিয়র অ্যান্ড ক্যাডেট টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো স্বর্ণ পদক জয় করেছে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্যাটাগরিতে এই কীর্তি গড়েছেন রামহিম লিয়ন বম, মুহতাসিন আহমেদ ও নাফিস ইকবালরা। ৮-১১, ১১-৯, ১১-৯ ও ১১-৯ সেটে জিতে বাংলাদেশকে স্বর্ণ পদক জয়ের উল্লাসে মাতান তারা। এ জয়ে মালদ্বীপে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ দল। এই আসরে এতদিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রৌপ্য পদকই ছিল বাংলাদেশের অর্জন। এবার স্বর্ণ জয়ের ইতিহাস গড়লেন লিয়ন-মুহতাসিনরা।

আবাহনীকে হারিয়ে ডিপিএল চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল

এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব। ২৬শে এপ্রিল মিরপুর শেরে বাংলায় টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের আবাহনী। আগে ব্যাট করতে নেমে আবাহনী ৬ উইকেটে ২২৯ রান করেছিল। নুরুল হাসানের ৮১ বলে ৮১ রানে ৩ ওভার বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় শেখ জামাল। ফলে ৪ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের শিরোপা জিতেছে ইমরুল কায়েসের দল।

আইসিসির 'সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের' তালিকায় সাকিব

সাকিব আল হাসান অনেকবারই র‍্যাংকিং সেরা অলরাউন্ডার হয়েছেন নানা ফরম্যাটে। ২৮শে এপ্রিল বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি তাদের ফেসবুক পেইজে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের একটা তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় সাকিব আল হাসান আছেন তিন নম্বরে। টি-টোয়েন্টি সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের এই তালিকায় সবার ওপরে আছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার শেন ওয়াটসন। তার রেটিং পয়েন্ট ৫৫৭। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৯৬ ম্যাচে ১১৯ উইকেট পেয়ে সবার শীর্ষে আছেন সাকিব আল হাসান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও সাকিব। ৩০ ম্যাচে ৪১ উইকেট শিকার করেছেন সাকিব।

বাংলাদেশের ফুটবলে প্রযুক্তির ছোঁয়া

মাঠে ফুটবলাররা কতটা দৌড়ালেন, তাদের ফিটনেস লেভেল কোন পর্যায়ে– এমন তথ্য-উপাত্ত নিয়ে ভিডিও অ্যানালাইসিস চলে কোচদের। ম্যাচের আগে কোচকে ভাবতে হয় ফরমেশন, প্লেয়িং স্টাইল, ফুটবলারের গতি, দূরত্ব কমানোর সক্ষমতা– এসব জেনেই কোচ পরিকল্পনা সাজান। খাতা-কলম দিয়ে এই কাজ হয় না। নোটবুকে লেখা হারিয়েও যেতে পারে। যে কারণে দিন শেষে কোচদের ভরসা ড্রয়িং বোর্ড। আর এই কাজটি সহজ হয়েছে প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। তাই শিগগিরই ভিডিও অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশের ফুটবল। জানা গেছে, ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলে বহুল ব্যবহৃত ইনস্ট্যান্ট এবং স্পোর্টস কোর সফটওয়্যারের সাবস্ক্রিপশন কিনেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ৮-১৪ই জুন মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ ফুটবলের বাছাইপর্ব। ১৬ই মে থেকে এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে বাংলাদেশ দল। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ফুটবলে দেখা যাবে ভিডিও অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

চলে গেলেন সাংবাদিক, কবি ও গীতিকার কে জি মোস্তফা

আফরোজা রুমা

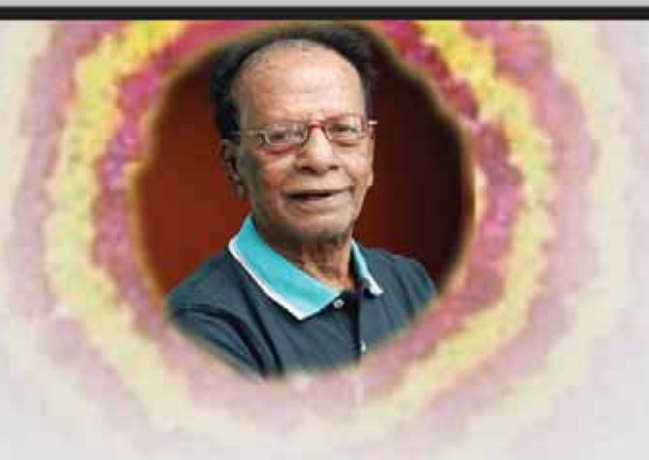

সাংবাদিক, কবি, গীতিকার ও কলামিস্ট কে জি মোস্তফা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৮ই মে আজিমপুরে নিজ বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ও হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

- তোমারে লেগেছে এত যে ভালো...
- আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন...

এমন অনেক কালজয়ী জনপ্রিয় গানের গীতিকার কে জি মোস্তফা। তিনি ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে *দৈনিক ইত্তেহাদে* শিক্ষানবিশ হিসেবে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নেন তিনি। ওই বছরই *দৈনিক মজলুম*-এ সহসম্পাদক পদে নিয়োগ পান। পত্রিকাটি বিলুপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন তিনি। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৬৮ সালে ফের সাংবাদিকতা শুরু করেন *সাপ্তাহিক জনতায়*। ১৯৭০ সালে সাবেক মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা কফিলউদ্দীন চৌধুরীর প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। সেসময় তিনি সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে প্রথম শ্রেণির রেডিও সার্ভিসের জন্যও মনোনীত হন। তবে মুক্তিযুদ্ধের কারণে চাকরিতে যোগ দেননি। স্বাধীনতার পর কে জি মোস্তফা *দৈনিক গণকণ্ঠ*, *দৈনিক স্বদেশ*, *দৈনিক জনপদ*সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেন। তিনি *নূপুর* নামে একটি বিনোদন মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭৬ সালে বিলুপ্ত সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক হিসেবে কে জি মোস্তফা বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারভুক্ত হন এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। পদোন্নতি পেয়ে প্রথমে সম্পাদক, পরে সিনিয়র সম্পাদক পদে উন্নীত হন। কে জি মোস্তফা ১৯৯৬ সালে অবসর নেন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত কিশোর পত্রিকা *নবারুণ*, সাহিত্য মাসিক *পূর্বাচল*, *সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সংবাদ* এবং সর্বশেষ *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র *অগ্রদূত*-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবনেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। এক পর্যায়ে গান লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর লেখা বেশ কিছু গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এ পর্যন্ত তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। এছাড়া বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ, ছড়ার বই ও গল্পের বই রচনা করেন তিনি। নাম লেখান চলচ্চিত্র পরিচালনায়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কিছু সম্মাননা, সংবর্ধনা, পদক পেয়েছেন। কুমিল্লা অলক্ত সাহিত্য সংসদ, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ললিতকলা বিভাগের 'সফেন', 'সৃজনী' সংগীতগোষ্ঠী, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডাকসু'সহ বিভিন্ন সংগঠন থেকে সম্মাননা, সংবর্ধনা ও পদক পেয়েছেন।

প্রখ্যাত গীতিকার এবং বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তা কে জি মোস্তফার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, কে জি মোস্তফা একজন সুশীল সেবক ও সাংবাদিক হিসেবে এবং তাঁর রচিত যেসব গান দশকের পর দশক মানুষের মনে জাগরুক হয়ে আছে, সেই জনপ্রিয় সব গানের মধ্য দিয়েই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। এসময় মন্ত্রী প্রয়াত এই সৃষ্টিশীল কর্ম প্রতিভার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

৯ই মে বাদ জোহর প্রেসক্লাবে কে জি মোস্তফার প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিকসহ মরহুমের দীর্ঘদিনের সহকর্মী, স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ। তাঁর কফিনে শ্রদ্ধা জানায় জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (দুই অংশ) ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। পরে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন কে জি মোস্তফা।

mwPÎ evsjv‡`k পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা/ছড়া, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা/ছড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতা/ছড়ার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা/ছড়া পাঠাতে হবে। কবিতা কিংবা ছড়াগুচ্ছ কোন বিভাগের জন্য লেখা– তা স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 12, May 2022, Tk. 25.00

cgËv cÙvi eyK Av‡jv Sjg‡j evOwji M‡ei †mZz GKm‡½ R‡j DVj ¯‡ci cÙv †mZz gvIqv I RwRiv cv‡ši 415wU jvBU

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd